সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩ মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯

পাল্‌কি চলে
কোথাও যাযাবর বেদুইন দস্যুদল দিগন্তে বিলীন বিশাল মরু-প্রান্তরের বুকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে…শ্যামল অরণ্যে শিকারের অন্বেষণে বিচরণ করছে হিংস্র শ্বাপদ… কাজল-কালো অথৈ জলে ভেসে চলেছে ‘ময়ূরপঙ্খি নাও’ —আবার কোথাও রয়েছে ঊর্মিমুখর বিস্তীর্ণ নীলাম্বু… সুদূরের হাতছানি যখন কিশোর রবীন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করে তুল্‌ত তখন তিনি ঠাকুমা'র আমলের একটা পুরনো পাল্‌কির ভিতরে চুপি চুপি ঢুকে পর্দা টেনে দিয়ে বসে পড়তেন। তারপর চোখ দু'টি বুজে কল্পনা করতেন পাল্‌কিটা যেন যাদুমন্ত্রে ভরা একটা উড়ন্ত গালিচা, তাঁকে নিয়ে শূন্যপথে ভেসে চলেছে মায়ায় ঘেরা অচেনা অজানা কোন রাজ্যে। দেশ-দেশান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। উত্তরকালে কবিগুরু সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। ‘জগতের আনন্দ-যজ্ঞে’ নানা বৈচিত্র্য ও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি দু'টি নয়ন মেলে অপরূপকে দেখেছেন—কৈশোরে একটা পাল্‌কির মধ্যে বসে দেখা স্বপ্ন ‘সত্য’ হয়ে উঠেছে।
D
ডানলপ
কর্তৃক প্রচারিত
‘পথিক কবি’ পর্যায়ের অন্যতম
DC-558 BEN

কিউ করে দাঁড়ানোই ভাল
অন্যথায় দেরী হবার সম্ভাবনা

পায়ে হেঁটে পরমায়ু
রোদের খরতা যখন কম, ঘর ছেড়ে আসুন
বাইরে—খোলা হাওয়ায়। চলুন পায়েহাটা পথ ধরে
যেখানে দু'চোখ চায়, বাধা নেই সেই প্রান্তরে।
খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, এই পথ প্রকৃতির। তাই নীরোগ
আনন্দ এই পথে, এই পথে পরমায়ু। এই হাঁটাপথে
চলতে পথিকের পরম বন্ধু বাটা।
টাফিস ১১.৯৫—১৫.৫০
আডা ১২.৯৫
লংলাইফ অক্সফোর্ড ১৬.৫০
কমফর্ট ২৪.৯৫
Bata

সুন্দর থেকে সুন্দরতম...
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৬০

আপনার ব্লক
নির্ব্বাচনও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34·3793
Gram. Otogravure
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস
২১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
গুণসম্পন্ন তৈল
এম. এল, বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ · ১৮৮৪-৫ শক

সম্পাদক শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯ · ১৮৮৪-৫ শক

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[২] ভিন্নপ্রদেশী আমার এক বন্ধু বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল্‌তে অনুরোধ করেচেন। একদিন এ কাজ করেচি— তখন ভেবেছিলুম ব্যাপারটা খুবই সহজ। সেকালে নাড়ী টিপেই ছন্দের ধাত বিচার করা যেত, এখন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ডায়োগনোসিস্ চলচে; যাকে সহজ মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেগুলো দুর্ব্বোধ হয়ে দেখা দিয়েছে, অথচ ডাক্তারে ডাক্তারে মতের মিল হচ্চে না। যারা জিজ্ঞাসু, পূর্ব্বের চেয়েও তাদের অবস্থা শোচনীয়। তাই, আমি আনাড়ি, এ কথা কবুল করেই বৈজ্ঞানিক দুর্গম পথটা এড়িয়ে আপন মেঠো রাস্তায় চল্‌ব।

সকলেই জানেন ভাষায় প্রকাশের রীতি আছে দুই জাতের। গদ্য আর পদ্য। গদ্য মুখ্যত বলে, পদ্য মুখ্যত চলে। গদ্যে কমা সেমিকোলন দাঁড়ির ভাগ আছে, সেটা বলার ভাগ; আর পদ্যে পদবিচ্ছেদে যে-ভাগ দেখা যায় সেটা চলার ভাগ।

মানুষের চলন দুই পায়ের চলন। মাত্রায় মাত্রায় পদক্ষেপের দ্বারা এই চলন বিভক্ত। মানুষকে পা তুলে ও ফেলে চল্‌তে হয় ব'লে এই চলায় ছন্দ লেগেই আছে। যেমন ছন্দ আছে হৃৎপিণ্ডের ওঠায় পড়ায়। চল্‌তে চল্‌তে যখন হাত দোলে তখন সেই চলার ছন্দের ঝোঁক তাতেও ধরা পড়ে।

যে হেতু মানুষের পা ফেলার মধ্যে একটা সহজ ভাগ আছে এইজন্যে সাধনার দ্বারা সেই ভাগটাকে মানুষ বিচিত্র করে তুলেচে। যার শক্তি আছে সে এই চলার ছন্দকে নানা বিচিত্র ছন্দে শাখায়িত করে নৃত্যরূপে দেখাতে পারে।

এই নৃত্যের একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য্য আছে। সে কেবল গতির আন্দোলনেই মনকে আন্দোলিত [৪] করতে পারে। কিন্তু নাচ এইখানেই থামেনি। তার সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেচে। আমাদের হৃদয়াবেগের মধ্যে একটা আন্তরিক আন্দোলন আছে। আমাদের রক্তস্রোতকে সে দোলা দেয়, আমাদের নিঃশ্বাসকে সে ক্ষুব্ধ করে। এই ক্ষোভকে নৃত্য যখন আপন সুনিয়মিত চাঞ্চল্য দিয়ে প্রকাশ করে তখন আমাদের সেই ভাবের আবেগ আপন প্রতিদিনের তুচ্ছতাকে ছাড়িয়ে ওঠে, একটা বিশিষ্ট নিত্যরূপ ধারণ করে, সে রূপ আর ব্যক্তিগত থাকে না, সে হয়ে ওঠে বিশ্বগত, যেমন সাজাহানের তাজমহল।

আমাদের পদ্যের পদচালনাকে এই দিক থেকে বিচার করা যাক্। পদ্য মানুষেরই মতো পদস্থ জীব— সাপের মতো অপদস্থ নয়। সাপ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অগ্রসর হয়, তার গতি নিতান্তই প্রয়োজনের গতি; প্রাণ

ধারণের আবশ্যকে তাকে চলাফেরা করতে হয়। কিন্তু পাখী পেয়েচে দুই পা, সে নাচতে পারে। সারসের যুগলনৃত্য দেখেছি, তাদের নাচ ভাবপ্রকাশের ভাষা, সে লিরিক কাব্য। সাপের মনে আবেগ যতই থাক সে ইচ্ছে করে নাচে না।

কিন্তু সাপুড়ে তাকে বাঁশি বাজিয়ে নাচায়। তখন সাপ আপন দেহের একটা অংশকে চলার প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে। সেই অংশ কেবল অকারণ আন্দোলনের স্বাধীনতা পেয়েচে, তাই সে বাঁশির ছন্দের আনন্দ আপন ফণার দোলায় প্রকাশ করতে পারে।

মানুষের দুই পা এমনভাবে তৈরি, যাতে সে প্রয়োজনের চলাও চলে, অপ্রয়োজনের নাচও নাচে। দুটো পা নিয়ে চলে বলেই প্রত্যেক পদক্ষেপেই পালায় পালায় এক পায়ের উপরে মানুষকে আপন শরীরের ওজন সামলিয়ে এগোতে হয়। চলবার সময়ে তার হাতের দোলন এই ওজনরক্ষারই অঙ্গ। এই ওজনরক্ষার দরকার কুকুরের নেই, তার চারটে পা-ই চলার প্রয়োজনে নিযুক্ত। তার দেহের অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ ল্যাজটা। এই কারণে ভাবের উচ্ছ্বাসে ঐ ল্যাজের দোলাতেই কুকুরীয় ছন্দে তার নাচের কাজ নির্ব্বাহ হয়।

[৬] প্রতিদিনের সাধারণ আলাপে আমাদের ভাষার সবটাই দরকারী হয়ে ওঠে, তার প্রত্যেক কথার কাছ থেকে খাঁটি অর্থের হিসেবটুকু আদায় করি। "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল" এই বাক্যটা খবরের বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু শুধু রিপোর্ট্ না দিয়ে ব্যাপারটাকে যদি রূপ দিতে হয় তাহলে ভাষাকে নাচিয়ে দেখাতে হবে—

বিদ্যুৎলাঙ্গুল করি ঘন তর্জ্জন
বজ্রদিগ্ধ মেঘ করে বারি বর্জ্জন,—
সেই মতো বেদনায় অস্থির শার্দ্দূল
অস্থি-বিদ্ধ গলে করে ঘোর গর্জ্জন।

গদ্যের ভাষা সর্ব্বাঙ্গ দিয়েই চলে ব'লে তাকে কেবল শব্দের অর্থ বহন করতে হয়, কিন্তু শব্দের ওজন সাম্‌লাতে হয় না। পদ্যে তাকে পদভাগের উপরে দাঁড় করাতেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ unstable equilibrium-এর হোলো সৃষ্টি। তখন তার উপরে ওজন-সামলানোর কঠিন দায়িত্ব পড়ল। শব্দব্যূহের বিশেষত্ব অনুসারে এই ওজনের সংস্থান নানারকম হতে পারে; সেই বৈচিত্র্যেই ছন্দের বৈচিত্র্য।

সংক্ষেপে বলি :— পদ্যের পদ আছে গদ্যের পদ নেই। গদ্য প্রধানত বলে, পদ্য প্রধানতঃ চলে। বলার বিশুদ্ধিতায়, সুস্পষ্টতায়, তার যাথার্থ্যে গদ্যের গৌরব, আর চলার ভঙ্গিমায়, বৈচিত্র্যে, ভাবাবেগের ব্যঞ্জনায় পদ্যের গৌরব।

বিশেষ পদবিভাগ ও শব্দের বিশেষ ওজন এই দুই নিয়ে ছন্দ। প্রত্যেক পাফেলার সঙ্গে কতটা ভার আছে তাই নিয়ে ছন্দের বিশেষত্ব। শুধু দেহের ভঙ্গীটা নাচের পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই ভঙ্গীর সঙ্গে দেহের ভার যতটা বিক্ষেপ করা যায় সেই অনুসারে নাচের নানা মূর্ত্তি। নাচে দেহের ভারটাকে কেবলি এদিকে ওদিকে নাড়ানাড়ি করতে হয়। দেহেরই মধ্যে একসঙ্গে ভারও আছে গতিও আছে,

তারই ব্যবস্থা করতে করতে নাচের রূপ জাগে। ছন্দেও তেমনি। ভাষায় [৮] শব্দের গতিও আছে আর তাতে ধ্বনির ভারও আছে। তারই বৈচিত্র্যসাধনে ছন্দ। গতিভাগের একএকটি একককে বলা যাক্ পদ, তার সেই পদবর্ত্তী ধ্বনির একককে বলা যাক মাত্রা।

[৭] বস্তুজগতের সত্তার মূলেও এই নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক আদিভূতের সঙ্গে একটা বোঝা আছে, আর সেই সঙ্গে আছে চলা ; বিশেষসংখ্যক প্রোটোন্ ইলেক্‌ট্রোন্, আর সেই প্রোটোন্ ইলেক্‌ট্রোনের আবর্তনগতি। গতিবেগ যেমনি হোক্, ইলেক্‌ট্রোন প্রোটোনের সংখ্যার কমিবেশি নিয়েই শিষের সঙ্গে সোনার প্রভেদ। আমাদের প্রতীতির মধ্যে সে প্রভেদ তো কম নয়। তেমনি অধিকাংশ ছন্দেরই গতি-ভাগ হয়তো চার, কিন্তু কোনোটাতে তার ধ্বনিমাত্রার এক রকমের পরিমাণ, কোনোটাতে অন্য রকমের পরিমাণ। তাতেই আমাদের চেতনাতে সে দোলা দেয় ভিন্ন ভিন্ন ধারায়।

[৮] সব চেয়ে সাদা ছন্দ হচ্চে দুই ধ্বনিমাত্রা নিয়ে দুই পদপাতন। আমার ছাত্র অবস্থার আরম্ভেই এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল— সেদিন "কর" "খল" বানান করে পড়তে পড়তে হঠাৎ এসে পড়ল, জল পড়ে পাতা নড়ে। ঐ একটুখানি ছন্দে মন উঠেছিল নেচে। মনে হোলো সামনে একটা সজীব বাণী। যেন হাল্‌কা দেহটুকু নিয়ে শালিখ পাখী লাফ দিয়ে দিয়ে চল্‌চে। এর গতির ভাগ এক দুই, এক দুই, একপা দুপা, একপা দুপা। এই প্রত্যেক পা পড়চে দুটি মাত্রার বোঝা নিয়ে। জ-ল, প-ড়ে ইত্যাদি।

তার পরে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, প্রথম শ্রেণীর ছন্দের পত্তন দুইমাত্রার গুণকের উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক পদের বোঝার পরিমাণ দুই, চার বা আট মাত্রা। এই শ্রেণীর ছন্দ পয়ার, প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় সব চেয়ে প্রচলিত। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে দুটি করে পদ এবং প্রত্যেক পদে আটটি করে মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় একটা করে ঝোঁক পড়চে। যথা :—

| |
একজামিনেশন্ বসে | সেনেটের হলে •• |
| |
পটোলডাঙায় ছাত্র | চলে দলে দলে •• |

এই আটমাত্রাকে যদি আরো ছোটো খণ্ডে ভাগ করা যায়, যথা দুই দুই দুই দুই, অথবা চার চার, এবং প্রত্যেক দুই কিম্বা চার মাত্রার উপর ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহলে পয়ারের যথার্থ চাল খাটো হয়ে পড়ে। যথা

| | | | | | |
কেন | তার | মুখ | ভার | বুক | ধুক | ধুক |
| | | | | | |
চোখ | লাল | লাজে গাল | রাঙা | টুক | টুক ॥

অথবা

স্থনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে ·· |

ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে ·· |

[১০] বলা বাহুল্য পয়ার ও ত্রিপদীর একই গোত্র— অর্থাৎ প্রত্যেক আটমাত্রায় তার পা পড়ে— যেমন

আঁধখানি চাঁদ ওঠে।

দিক্‌-ললনার ঠোঁটে

সরমে যেনরে ফোটে

স্মিত হাসিখানি ॥

এই শ্রেণীর সব চেয়ে প্রশস্ত ছন্দ দীর্ঘ পয়ার। এই ছন্দ বড়দাদা[1] সবপ্রথমে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। এই ছন্দে প্রত্যেক লাইনে দুই পদক্ষেপ। প্রথম পদে আটমাত্রা নিয়ে ঝোঁক, দ্বিতীয় পদে দশমাত্রা নিয়ে। তাঁর কাব্য থেকে এই ছন্দের দুটি লাইন উদ্ধৃত করি :—

গম্ভীর পাতাল, যথা | কালরাত্রি করালবদনা

বিস্তারে একাধিপত্য, | শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা।

পয়ারজাতীয় ছন্দের দুইটি মহদ্‌গুণ, এক তার ভারবহনশক্তি, আর তার গাম্ভীর্য। এইজন্যে বাংলাভাষায় এর প্রভাব এত বেশি।

[১১] পয়ারে বা দীর্ঘপয়ারে এই যে এক ঝোঁকে আটদশমাত্রা গড়িয়ে চলা এটা সংস্কৃতে চলে না, ইংরেজিতেও না। কারণ সংস্কৃতে প্রত্যেক শব্দের মধ্যে দীর্ঘহ্রস্বের অসমানতা। এই অসমানতার খেলা নিয়েই তার ছন্দ।— অস্ত্যুত্তরস্যাম্ দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ :— এই ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতায় ছন্দ তরঙ্গিত। ইংরেজি ছন্দের অসমানতা তার প্রত্যেক এক্‌সেণ্টবিদ্ধ শব্দে। বাংলায় এক্‌সেণ্ট্‌ নেই, স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নেই। আমরা বাক্যের আরম্ভশব্দে একটা ঝোঁক দিই, সেই ঝোঁকে আমাদের মসৃণ সমতল ভাষার উপর দিয়ে অনেকগুলো শব্দ গড়িয়ে চলে যায়। "আমি গেল শনিবারের দিন কলকাতায় গিয়েছিলুম"— এক নিঃশ্বাসে সমস্ত বাক্যটা দাঁড়িতে এসে পৌছয়। আমাদের ভাষার এই অবন্ধুরতায় বাক্যের অর্থ জোরের সঙ্গে মনে ঘা দেয় না। এই অভাব লাঘব করবার জন্যে পাঁচালিতে কবির গানে অনুপ্রাসের প্রাদুর্ভাব। সেই অনুপ্রাস অনেক স্থলেই অর্থহীন, কিন্তু উপস্থিতমত তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, শ্রোতাদের চমক লাগে, অন্যমনস্ক হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে।

---

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে রে লক্ষ্মণ, একি অলক্ষণ,
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।
অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে,
ঘোর অরণ্যমাঝে কত কাঁদিলাম—
আহা অপার জলধি কেন বাঁধিলাম।

মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি ঘন ঘন ব্যবহারদ্বারা পয়ারের একটানা একঘেয়ে চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তাঁরও অনবধানতা মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভে প্রকাশ পেয়েছে। যথা

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে
পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি।

এই এতগুলো লাইনের মধ্যে আরম্ভে "সম্মুখ" এবং শেষে "রক্ষঃকুল" শব্দে সংযুক্তবর্ণের বাধা আছে। এর সঙ্গে প্যারাডাইস্ লস্টের সূচনা অংশ তুলনা করে দেখ্‌লে উভয়ের প্রভেদ স্পষ্ট হবে।

আমি একদা ছন্দের এই ক্ষীণতার প্রতিকারের উপায় ভেবেছিলুম। সংস্কৃতের অনুবর্ত্তন করে স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘতা প্রচলন করতে গেলে সে কৃত্রিমতা বেশিক্ষণ চলে না। তার অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক কাব্যের প্রয়োজন সাধন করতে পারে। যেমন—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতিপিরহনে মান রয় না।

মানসী লেখবার সময় একটা সংকল্প মনে এসেছিল, যুক্তবর্ণের ধ্বনিকে দুইমাত্রিক বলে গণ্য করে যথাস্থানে তার প্রয়োগ এবং অযথাস্থান থেকে তার বর্জ্জন। বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণ তখন সর্ব্বত্রই একমাত্রিক শ্রেণীতেই গণ্য ছিল। সেইজন্যে "বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া" এমনতরো লাইনের সৃষ্টিতেও কবির সঙ্কোচ হয় নি। এখানে যুক্তবর্ণ ছন্দকে পীড়িত করেছে এ কথা এখনকার দিনে বলা বাহুল্য।

[১৩] পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি ছন্দে যেখানে প্রত্যেক পদে তিন চার পাঁচ প্রভৃতি অল্পমাত্রার সমাবেশ, কিম্বা যেখানে দুই + তিন, তিন + চার, প্রভৃতি যুগ্ম অযুগ্ম মাত্রাকে জুড়ে ছন্দ রচনা হয়েচে সেখানে পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি অনুসারে যুক্তবর্ণের ধ্বনিতে একমাত্রা গণনা করলে ছন্দ পীড়িত হয়।

[১০] এই ভারবহনের শক্তি উপলক্ষ্যে একটা কথা এইখানে বলে নিই। যাকে আমরা ধ্বনিমাত্রা বলচি তার সরুমোটা আছে। "চন্দন-চর্চ্চিত" কথাটাকে অক্ষর হিসাবে গ'ণে দেখলে দেখি ছয়মাত্রা; তাকে

ধ্বনির ওজনে তৌল করে দেখলে দেখি আটমাত্রা। সংস্কৃত ছন্দে যুক্ত অক্ষরের ধ্বনিতে দুইমাত্রাই গণনা করে। যুক্তবর্ণের ওজন অযুক্তবর্ণের চেয়ে যে ওজনে বেশি তা দুর্ব্বল বাহনের পিঠে চড়ালেই বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত দেখাই :

আঁখির পাতার নিবিড় কাজল
আঁখিজলে পড়ে গলিয়া।

[১২] অক্ষরসংখ্যা সমান রেখে যদি এই ছড়ায় যুক্তবর্ণ চড়ানো যায় তাহলে সেটা কেমন হবে যেমন এক এক সময়ে দেখতে পাই জোয়ান স্বামী স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্ম্মমভাবে। প্রমাণ দিই :—

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
অশ্রুজলে পড়ে গলিয়া।

কিন্তু এই বোঝা পয়ারজাতীয়ের স্কন্ধে চাপানো যাক্ তাতে অপঘাতের সম্ভাবনা থাকবে না। প্রথমে বিনা বোঝার চালটা দেখাই

শ্রাবণের কালো ছায়া ছেয়ে দেয় তমালের বনে,
যেন দিক্‌ললনার গলিত কাজল বরিষণে।—

এইটেকেই গুরুভার করে দিই—

বর্ষার তমিস্রছায়া পরিব্যাপ্ত অরণ্যের তলে,
যেন অশ্রুসিক্ত আঁখি দিগ্বধূর গলিত কজ্জলে।

এ হোলো আটমাত্রা দশমাত্রার ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ।

আমি বাংলার সমস্ত ছন্দকে তার প্রত্যেক পদের মাত্রার পরিমাণ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছি। এক হচ্চে দুইমাত্রা যার মূলে; দ্বিতীয় তিনমাত্রা; তৃতীয় দুইতিন বা তিনচার বা চারপাঁচ মাত্রা। এ ছাড়া অন্য শ্রেণীর ছন্দ সংস্কৃত ভাষায় আছে কিন্তু বাংলায় আছে বলে আমি জানিনে।

তিনমাত্রার ছন্দ : যথা

শ্রাবণধারার নিঠুর আঘাতে
মালতী পড়িছে ঝরিয়া,
গন্ধে তাহার বাদল বাতাস
উঠে করুণায় ভরিয়া॥

নববর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া
সৌরভে তার সিক্ত পবন
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

[১৪] এই ছন্দটিকে দুরকম করে ভাগ করা যায়, প্রতিপদে তিনমাত্রায় কিম্বা ছয়মাত্রায়। পড়তে গেলে দেখা যাবে বড়ো ভাগের আয়তন যে ছোটো ভাগের দ্বিগুণ তা নয়, তার চেয়ে বেশি।

শ্রাবণ | ধারার | নিঠুর | আঘাতে—

এর প্রত্যেক ঝোঁক যেন সমান সমান ঘর্ষণে স্ফুলিঙ্গবর্ষণ করচে— প্রত্যেকটির পরিমাণ খুব আঁট। কিন্তু ছয়-মাত্রার ঝোঁকে একটা করে বাড়্‌তি টান থাকে—

| |
শ্রাবণধারা—র | নিঠুর আঘাতে— |
| |
মালতী পড়িছে— | ঝরিয়া— ॥

লম্বা মাত্রার পদভাগে আমাদের আবৃত্তি স্বভাবত একটু যেন ঢিল দিতে চায়, একেবারে খট্‌খট্‌ করে চলে না। এর থেকেই বুঝতে পারি হ্রস্ব বা দীর্ঘ পয়ারের আট, অথবা আটদশ মাত্রার লম্বা চালের আবৃত্তিতে ভিতরে ভিতরে ফাঁক থেকে যায়, তাই মোটা মোটা যুক্তবর্ণও এই ছন্দে অভদ্র রকমের ঠেলাঠেলি করে না। তারা যথেষ্ট আরাম পায়। এইজন্যে এই ছন্দটাকে সাধুভাষার ছন্দ বলা যেতে পারে ॥

তিনের ছন্দকে নয়মাত্রায় প্রশস্ত করা চলে। যেমন—

আঁধার রজনী পোহালো,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাতকিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে ॥

কিন্তু তিনমাত্রার ছন্দকে যতই চওড়া করি না কেন দুইমাত্রার ছন্দের মতো এ'কে উদার করা যায় না, এর দৌড় চাল, সেইজন্যে এ অতিরিক্ত বোঝা নিতে রাজি নয়, "আঁধার শর্ব্বরী পোহালো" এর সইবে না।

বাংলায় আর এক ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে যার মাত্রাগুলি যুগ্মঅযুগ্ম সংখ্যায় জোড়া। যথা

| |
[১৬] আঁধার রাতি | জেলেছে বাতি |
|
অযুতকোটি তারা,
আপন কারাগারে সে পাছে
আপনি হয় হারা ॥

তিনচারের মাত্রা—

নয়ন-অতিথিরে
শিমূল দিল ডালি ;—
নাসিকা প্রতিবেশী
তা নিয়ে দেয় গালি।
সে জানে গুণ শুধু
প্রমাণ হয় ঘ্রাণে,—
রং যে লাগে রূপে
সে কথা নাহি জানে ॥

[১৮] সমস্ত প্রবন্ধে যত দৃষ্টান্ত দিয়েছি সবই লৈখিক ভাষার। লৈখিক[২] ভাষাতেও ছন্দের মূলতত্ত্ব একই। তার একটি প্রমাণ দিয়ে উপসংহার করি।—

২ ভ্রমক্রমে লেখা হয়েছে 'লৈখিক'। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত শব্দটি বোধ হয় 'মৌখিক'।—দ্র রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থ (কার্তিক ১৩৬৯), পৃ ৪৪৫ পাদটীকা।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান—
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান ॥

এও পয়ার। হসন্তের জালে বাঁধা এর শব্দপুঞ্জের চেহারাটাকে বড়ো দেখাচ্চে। এ'কেই সাধুভাষার কাঠামোয় ভরলে ছন্দটার শ্রেণীনির্ণয় সহজ হবে—

যথা বৃষ্টি ঝরে ঝরো ঝরো ডেকে এলো বান,
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যে দান ॥

[১৬] ছন্দ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে তা শেষ হোলো। মূলকথাগুলো বেশি নয়, তার সন্ধান জান্‌লে শাখা প্রশাখা চিনে নেওয়া সহজ হয়। আমি যখন ছোটো ছেলেদের পড়াতুম তখন কাব্য পড়াবার বেলায় সবপ্রথমে কাব্যের ছন্দোরূপ নিয়ে আলোচনা করতুম। জিজ্ঞাসা করতুম বিশেষ কাব্যের লাইনে ক'টা ভাগ, আর প্রত্যেক ভাগে ক'টা মাত্রা। এই যথেষ্ট। ভালো করে বুঝিয়ে দিলে ছোটো ছেলেদের পক্ষেও এ প্রশ্ন কঠিন নয়। কিছুদিন এটা চর্চ্চা করলে ছন্দপতন হয় কী দোষে তা তারা বুঝতে পারবে এবং ছন্দ নিয়ে কারবার করি বলে বিশেষ জাতের একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস বলে মনে করবে না। অবশ্য এ কথাটা তাদের যত শীঘ্র পারা যায় বুঝিয়ে দেওয়া ভালো যে ছন্দরচনা করা এবং কাব্যরচনা করা একই কথা নয়। নইলে কবিকে তাদের প্রতিযোগী মনে করে একদা তাকে খর্ব্ব করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে ॥

রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত। ১৯৭-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি, পৃ ১-১৮।
বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যাগুলি উক্ত পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক।
এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থের (কার্তিক ১৩৬৯) 'পাণ্ডুলিপি-পরিচয়', পৃ ৪৪৩-৪৪৫।

রসাদ্বৈতবাদ

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

> "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি"
>
> —তৈত্তিরীয়োপনিষদ্
>
> "তদেবং মূলং বীজস্থানীয়ঃ কবিগতো রসঃ।...ততো বৃক্ষস্থানীয়ং কাব্যম্। তত্র পুষ্পাদিস্থানীয়োঽভিনয়াদিনটব্যাপারঃ। তত্র ফলস্থানীয়ঃ সামাজিকরসাস্বাদঃ। তেন রসময়মেব বিশ্বম্"— অভিনবগুপ্ত

১

ভারতীয় মনীষার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টিতে ধরা না পড়িয়া পারে না। একদিকে ইহা যেমন প্রত্যেক প্রতিপাদ্য তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম ভেদনিরূপণের সাহায্যে শ্রেণীকরণ বিষয়ে আপন প্রবণতা প্রকট করিতে সর্বদা ব্যগ্র, অপর দিকে তেমনই প্রতিলোম দৃষ্টিতে সেই স্বপরিকল্পিত অগণিত শ্রেণী ও অবান্তরভেদ সমূহকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর তত্ত্বের মধ্যে উন্নীত ও সমীকৃত করিবার অলোকসামান্য শক্তিও তাহার এক অসাধারণ লক্ষণ। ভারতীয় মনীষার এই উভয়বিধ লক্ষণই প্রাচীন সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আপন আপন সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সাহিত্যবিচার শাস্ত্রের মুখ্য প্রমেয় রসতত্ত্ব সম্পর্কিত বিচারেও ভারতীয় মনীষার উপরি-নির্দিষ্ট দুইটি লক্ষণ কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা আমাদের লক্ষ্য।

আমরা জানি ভরতমুনি রসকেই কাব্যনির্মাণের একমাত্র উৎসরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন—'নহি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে'। রস হইতেছে মানব-মনের একজাতীয় আস্বাদনাত্মক অনুভব, যাহা কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থায়িভাবের উপযুক্ত বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সাহায্যে অভিব্যক্তির পরিণামাবস্থা। সুতরাং ভরতমুনি কাব্যে রসীভবনযোগ্য কয়েকটি স্থায়িভাবের পরিগণনা করিয়াছেন তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত কারিকাদ্বয়ে—

> "শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
> বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ॥
> রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
> জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"[১]

অবশ্য কোনও কোনও মতে ভরতমুনি 'শান্ত' নামে নবম রস এবং তদুপযোগী নির্বেদাখ্য নবম স্থায়িভাবও স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী কাব্যমীমাংসকগণ রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমুনির সিদ্ধান্তই প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তবে স্থায়িভাবের এবং রসের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে আগ্রহও যে কোনও কোনও আচার্যের

১ নাট্যশাস্ত্র, ৬, ১৫, ১৬। পণ্ডিত এস্. রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত 'গাইকবাড় প্রাচ্য গ্রন্থমালা'-য় প্রকাশিত 'নাট্যশাস্ত্র' ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য (১৯৫৬)।

মধ্যে দেখা না যায়, তাহাও সত্য নহে। কেহ কেহ দশ একাদশ দ্বাদশ এমনকি তদপেক্ষাও অধিক রস ও তদুপযোগী স্থায়িভাবের অস্তিত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন।[২] মূলরসের শ্রেণীকরণ বিষয়েই কাব্য-বিচারকগণ যে আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই নহে; এক-একটি রসের অবান্তর প্রভেদ উদ্ভাবন বিষয়েও তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তির সাক্ষ্য সুপরিস্ফুট। যেমন, একমাত্র শৃঙ্গার রস বিষয়েই তাঁহাদের সমীক্ষার বিকাশ সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর। এক শৃঙ্গার রসেরই কত অবান্তরভেদ না পূর্বাচার্যগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেইরূপ বীররসেরও দান দয়া যুদ্ধ ধর্ম প্রভৃতি উপাধিভেদে অবান্তরভেদকল্পনা সুপরিজ্ঞাত। এইভাবে পরবর্তী আচার্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই যদিও ভরতকল্পিত নব-রসের অতিরিক্ত রসকল্পনা ও মূলরসের অবান্তরভেদকল্পনা বিষয়ে আপন আপন মনীষার স্বাতন্ত্র্য খ্যাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি রসের সংখ্যা বিষয়ে ভরতমুনির সিদ্ধান্তই সর্বজনগ্রাহ্যরূপে স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'রস-গঙ্গাধর' নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"অথ কথমেত এব রসাঃ? ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে—ভক্তের্দেবাদিবিষয়-রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।...

"ন চ তর্হি কামিনীবিষয়ায়া অপি রতের্ভাবত্বমস্তু, রতিত্বাবিশেষাৎ। অস্তু বা ভগবদ্ভক্তেরেব স্থায়িত্বম্, কামিন্যাদিরতীনাং চ ভাবত্বম্, বিনিগমকাভাবাৎ— ইতি বাচ্যম্। ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র রসভাবত্বাদি-ব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। অন্যথা পুত্রাদিবিষয়ায়া অপি রতেঃ স্থায়িভাবত্বং কুতো ন স্যাৎ? ন স্যাদ্বা কুতঃ শুদ্ধভাবত্বং জুগুপ্সা-শোকাদীনাম্— ইত্যখিলদর্শনব্যাকুলী স্যাৎ। রসানাং নবত্বগণনা চ মুনিবচননিয়ন্ত্রিতা ভজ্যেত— ইতি যথাশাস্ত্রমেব জ্যায়ঃ।"[৩]

উদ্ধৃত সন্দর্ভে স্বাধীনচেতাঃ পণ্ডিতরাজও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রবচনের প্রতিই আপন আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়স্থ 'অভিনব-ভারতী' নামক অপূর্ব ব্যাখ্যানগ্রন্থে গুপ্তপাদ ভরতমুনিপরিগণিত রসের নবত্বগণনার এক সুনিপুণ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। আমরা জানি, প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ যদিও আনন্দকেই সর্ববিধ কবিকর্মের পার্যন্তিক মুখ্য ফলরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি চতুর্বর্গব্যুৎপত্তিও যে তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হইয়া থাকে, সে কথা তাঁহারা একবারের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং রসপ্রধান নাট্যও তাঁহাদের মতে অবশ্যই পুমর্থোপযোগী হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে নাট্যবেদ সম্পর্কে ভরতমুনির নিম্নোদ্ধৃত বচনগুলি মনে পড়িবে—

---

২ 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' নামক সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধে ভোজরাজ যদিও দ্বাদশপ্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মতে রসের সংখ্যা যে তাহাতেই সীমাবদ্ধ নহে, ইহাও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। তু° "What exactly must be noted as the Rasas added by Bhoja are Udātta and Uddhata; for we can say in a way that Bhoja gave in the middle of his argument an indicative list of twelve Rasas, his final view however being either one or numerous Rasas."—Dr. V. Raghavan: *Bhoja's Sṛṅgāra Prakāśa*, Vol. I, Pt. II, p. 431.

৩ রসগঙ্গাধর: ১ম আনন, পৃ. ৫৫-৫৬ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ। ১৯৩৯)।

"কচিদ্ধর্মঃ কচিৎ ক্রীড়া কচিদর্থঃ কচিচ্ছমঃ।
কচিদ্ধাস্যং কচিদ্যুদ্ধং কচিৎ কামঃ কচিদ্বধঃ॥
ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।
নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রিয়া॥
ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যজননমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি॥
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ।
অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্॥
নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥"[৪]

অতএব ভরতমুনির মতে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ— এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ-সাধনই নাট্যের লক্ষ্য। এবং নাট্য যখন রসস্বরূপ,[৫] তখন নাটকে এমন সকল রসেরই অভিব্যক্তিসাধন কর্তব্য যাহার দ্বারা প্রেক্ষক সামাজিক-গণের চতুর্বর্গের অন্যতম পুরুষার্থলাভ সম্ভব হইতে পারে। ভরতমুনিপরিকল্পিত রসসংখ্যানিয়ন্ত্রণ এই মৌলিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত— আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার ভাষ্যে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এবং তে নবৈব রসাঃ। পুমর্থোপযোগিত্বেন রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়তামেবাপদেশ্যত্বাৎ। তেন রসান্তর-সম্ভবেঽপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যা সংখ্যানিয়ম ইতি যদন্যৈরুক্তম্, তৎপ্রত্যুক্তম্। ভাবাধ্যায়েঽপি চৈতদ্বক্ষ্যতে।[৬] আর্দ্রতাস্থায়িকঃ স্নেহো রস ইতি ত্বসৎ। স্নেহো হ্যভিষঙ্গঃ। স চ সর্বো রত্যুৎসাহাদাবেব পর্যবস্যতি। তথাহি— বালস্য মাতাপিত্রাদৌ স্নেহো ভয়ে বিশ্রান্তঃ। যূনোর্মিত্রজনে রতৌ। লক্ষ্মণাদৌ ভ্রাতরি স্নেহো ধর্মময় এব। এবং বৃদ্ধস্য পুত্রাদাবিতি দ্রষ্টব্যম্। এষৈব গর্ধস্থায়িকস্য লৌল্যরসস্য প্রত্যাখ্যানে সরণির্মন্তব্যা। হাসে বা রতৌ বাঽন্যত্র পর্যবসানাৎ। এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি।"[৭]

এমনকি অভিনবগুপ্তপাদ ভরতমুনি যে ক্রমে উপরিবর্ণিত আটটি বা নয়টি রস নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ক্রমনির্দেশের মধ্যেও পুরুষার্থভিত্তিক একটি যুক্তি আবিষ্কারে প্রয়াসী হইয়াছেন। শৃঙ্গারের পর হাস্য, হাস্যের পর করুণ, তাহার অব্যবহিত পরে রৌদ্র— এইভাবে রসের ক্রমিক নির্দেশের হেতু সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—

"তত্র কামস্য সকলজাতিসুলভতয়াঽত্যন্তপরিচিতত্বেন সর্বান্ প্রতি হৃদ্যতেতি পূর্বং শৃঙ্গারঃ। তদনুগামী

---

৪ নাট্যশাস্ত্র: ১ম অধ্যায়, শ্লোক ১০৮-১১২।

৫ দ্র° 'তেন রস এব নাট্যম্। যস্য ব্যুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচ্যতে।'— অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৬৭। অপিচ—"নাট্যাৎ সমুদায়-রূপাদ্রসাঃ। যদি বা নাট্যমেব রসাঃ। রসসমুদায়ো হি নাট্যম্। (ন) নাট্য এব চ রসাঃ। কাব্যেঽপি নাট্যায়মান এব রসঃ।..' —ঐ. পৃ. ২৯০।

৬ দ্র° "এতাবন্ত এব চ রসা ইত্যুক্তং পূর্বম্। তেনানন্ত্যেঽপি পার্ষদপ্রসিদ্ধ্যৈতাবতাং প্রযোজ্যত্বম্ ইতি যদ্ ভট্টলোল্লটেন নিরূপিতং তদবলেপেনাপরামৃষ্টেত্যলম্।"— ঐ. পৃ. ২৯৮।

৭ অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪১।

চ হাস্যঃ নিরপেক্ষভাবত্বাৎ। তদ্বিপরীতস্ততঃ করুণঃ। ততস্তন্নিমিত্তং রৌদ্রঃ। স চার্মষপ্রধানঃ। ততঃ কামার্থয়োর্ধর্মমূলত্বাদ্ বীরঃ। স হি ধর্মপ্রধানঃ। তস্য চ ভীতাভয়প্রদানসারত্বাৎ। তদনন্তরং ভয়ানকঃ। তদ্বিভাবসাধারণ্যসম্ভাবনাৎ। ততো বীভৎস ইতি যদ্‌বীরেণাক্ষিপ্তম্। বীরস্য পর্যন্তেঽদ্ভুতঃ ফলম্ ইত্যনন্তরং তদুপাদানম্। তথা চ বক্ষ্যতে—"পর্যন্তে কর্তব্যো নিত্যং হি রসোঽদ্ভুতঃ" (না°শা° ১৮.৪৩) ইতি। ততস্ত্রি-বর্গাত্মকপ্রবৃত্তিবিপরীতনিবৃত্তিধর্মাত্মকো মোক্ষফলঃ শান্তঃ। তত্র স্বাত্মাবেশেন রসচর্বণেত্যুক্তম্ ॥"[৮]

সুতরাং ধর্ম অর্থ এবং কাম প্রবৃত্তিপ্রধান ; অপরপক্ষে মোক্ষ নিবৃত্তিপ্রধান। অতএব এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নাট্যও যে প্রবৃত্তি নিবৃত্ত্যুপযোগী হইবে, তাহা তো নির্বিবাদসিদ্ধ। আর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যখন ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলারই দুইটি ছন্দ মাত্র, তখন নাট্যও সৃষ্টিরই প্রতিরূপক মাত্র হইবে—ইহাই প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণের সিদ্ধান্ত। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিশেষত্ব সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর মন্তব্য অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ—

Another attempt to make the Universe intelligible regards it as an eternal rhythm playing and pulsing outwards from spirit to matter (*pravṛtti*) and then backwards and inwards from matter to spirit (*nivṛtti*). This idea seems implied by Sankara's view that creation is similar to the sportive impulses of exuberant youth and the Bhagavad-gîtâ is familiar with *pravṛtti* and *nivṛtti*, but the double character of the rhythm is emphasized most clearly in Sâkta treatises. Ordinary Hinduism concentrates its attention on the process of liberation and return to Brahman, but the Tantras recognize and concentrate both movements, the outward throbbing stream of energy and enjoyment (*bhukti*) and the calm returning flow of liberation and peace. Both are happiness, but the wise understand that the active outward movement is right and happy only up to a certain point and under certain restrictions.[৯]

২

এইভাবে যদিও ভরতমুনি ও তাঁহার অনুগামী কাব্যলক্ষণবিধায়কগণ প্রধানতঃ রসের নববিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এই নানা প্রভেদ-প্রভিন্ন আস্বাদনাত্মক চিত্তাবস্থার একটি সামান্য প্রকৃতি ও একটি সাধারণ কারণ অন্বেষণ বিষয়েও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। জিজ্ঞাসুহৃদয়ে প্রথমেই একটি প্রশ্ন উদিত

---

৮ অভিনবভারতী. ১ম ভাগ. পৃ. ২৬৭। অপি চ তুলনীয় :—"তত্র পুরুষার্থনিষ্ঠাঃ কাশ্চিৎ সংবিদ এব প্রধানম্। তদ্ যথা—রতিঃ কামঃ তদনুষঙ্গিধর্মার্থনিষ্ঠা। ক্রোধস্তৎপ্রধানেষ্বর্থনিষ্ঠঃ। কামধর্মপর্যবসিতোঽপ্যুৎসাহঃ সমস্তধর্মাদিপর্য্যবসিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানজনিত-নির্বেদপ্রায়ো বিভাবো মোক্ষোপায় ইতি তাবদেষাং প্রাধান্যম্। যদ্যপি চৈষামপ্যন্যোন্যং গুণভাবোঽস্তি তথাপি তৎতৎপ্রধানে রূপকে তৎতৎপ্রধানং ভবতীতি রূপকভেদপর্যায়েণ সর্বেষাং প্রাধান্যমেষাং লক্ষ্যতে। অদূরভাগাভিনিবিষ্টদৃশস্ত্বেকস্মিন্নপি রূপকে পৃথক্ প্রাধান্যম্।"—ঐ. পৃ. ২৮২।

৯ Sir Charles Eliot : *Hinduism and Buddhism*, Vol. I, p. lxxxi. (Routledge & Kegan Paul Ltd., London. Third Impression, 1957).

হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইতেছে এই : ভরতমুনি যে আটটি কি নয়টি রস ও তদুপযোগী অনুরূপসংখ্যক স্থায়িভাব স্বীকার করিয়াছেন, ইহার তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? যদি বলা যায় ঐ কয়টি স্থায়িভাবই কেবল আস্বাদনাত্মক রসাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে তো কার্যতঃ স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল যে, সেই অভিন্ন কূটস্থ 'স্বাদ'-ই ইহাদের একমাত্র মূলপ্রকৃতি, পরস্পর প্রভেদ শুধু আপাতপ্রতীয়মান বিকৃতি মাত্র।[১০] যুক্তিটি যে বেশ বলিষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনবগুপ্ত স্বয়ং তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ভরতের একটি অতি প্রসিদ্ধ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির অবতারণা করিয়াছেন। ভরতাচার্য বলিয়াছেন—'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে'। এই পংক্তিটিতে 'রসাৎ' এই পদে একবচন প্রয়োগের হেতু নির্দেশ করিতে গিয়া অভিনবগুপ্ত বলিতেছেন—

"পূর্বত্র[১১] বহুবচনমত্র চৈকবচনং প্রযুঞ্জানস্যায়মাশয়ঃ—এক এব তাবৎ পরমার্থতো রসঃ সূত্রস্থানীয়ত্বেন রূপকে প্রতিভাতি। তস্যৈব পুনর্ভাগদৃশা বিভাগঃ।"[১২]

স্থলান্তরেও ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"তেন রস এব নাট্যম্। যস্য ব্যুৎপত্তিঃ ফলমিত্যুচ্যতে। তথা চ 'রসাদৃতে'-ইত্যেকবচনোপপত্তিঃ। ততশ্চ মুখ্যভূতাৎ মহারসাৎ স্ফোটদৃশীবাসত্যানি বা অন্বিতাভিধানদৃশীবোপায়াত্মকানি সত্যানি বা অভিহিতান্বয়দৃশীব তৎসমুদায়রূপাণি বা রসান্তরাণি ভাগাভিনিবেশদৃষ্টানি রূপ্যন্তে। ..."[১৩]

সুতরাং আপাততঃ রসের অনেক ভেদ স্বীকৃত হইলেও পরমার্থতঃ রসস্বরূপ যে অভিন্ন ও নির্বিকার এবং সকল প্রভেদের মধ্যেই যে সেই অদ্বৈত রসস্বরূপের স্ফূর্তি অনুস্যূত হইয়া আছে, ইহা রসতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা ভরতমুনিরও অপরিজ্ঞাত ছিল না, ইহাই আচার্য অভিনবগুপ্তের সুস্পষ্ট অভিমত। সেই সর্বপ্রভেদের মধ্যে অনুগত, সূত্রস্থানীয় 'মহারস', যাহা হইতে আর সকল রসের 'বিবর্ত্ত', স্বরূপজ্যোতিঃ স্ফোটতত্ত্ব হইতে যেমন বহুধা বাগ্‌বিবর্ত্ত— তাহার স্বরূপ বিষয়ে অবশ্য আচার্যগণের মধ্যে সম্মতি নাই। বৈদিক দেবতাতত্ত্বের আলোচনায় যেমন বিভিন্ন দেবগণ কখনও পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতেছেন, আবার কখনও সমস্ত দেবতার মধ্যে একই পরমা দৈবী শক্তির স্ফুরণ কীর্তিত হইতেছে, সর্বশেষ স্তরে যেমন পরমার্থতঃ একই পরমাত্মা ঋষিগণ কর্তৃক স্তুত হইয়াছেন, দেবতাভেদ শুধু কল্পনা মাত্র, সেই একই দেবতার বিলাসমাত্র, এবং সেই পরমাত্মতত্ত্বই যেমন জড় ও চৈতন্যের মিলনকেন্দ্ররূপে বিঘোষিত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়, এইভাবে আর্যগণের দেবতাবোধের ক্রমবিকাশের যেমন তিনটি প্রধান স্তর পরিলক্ষণীয়—পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যাহাদের নাম দিয়াছেন যথাক্রমে henotheism, pantheism এবং monotheism; অনুরূপভাবে রসতত্ত্বের আলোচনাও তিনটি পৃথক্ স্তর অতিক্রম করিয়া চরম অদ্বৈতবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।[১৪] একেবারে

---

১০ অভিনবভারতী ১ম ভাগ।

১১ তু° 'তত্র রসানেব তাবদভিব্যাখ্যাস্যামঃ'—নাট্যশাস্ত্র ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ. ২৭২।

১২ অভিনবভারতী ১ম ভাগ, পৃ. ২৭২।

১৩ ঐ. পৃ. ২৬৭।

১৪ দার্শনিক তত্ত্বের বিচারেও আরম্ভবাদ, সংঘাতবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদের মধ্য দিয়া বেদান্তবাদের অদ্বৈতবাদে উত্তরণ এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়িবে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৺মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ প্রণীত 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়' (Adharchandra Mookerjee Lectures, 1952 : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) নামক গ্রন্থের 'বেদান্তদর্শনের আলোচনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য : পৃ. ৮০-৮৯।

প্রাথমিক স্তরে সকল রস এবং তদুপযোগী স্থায়িভাবকেই স্বতন্ত্র ও স্বলক্ষণ রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—ইহা বৈদিক দেবতত্ত্বে polytheism-এর অনুরূপ। পরবর্তী স্তরে কোনও একটি রসকে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠ রস রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—কখনও শৃঙ্গারকে, কখনও বা করুণকে ইত্যাদি। তৃতীয় স্তরে, সমস্ত রসের মধ্যেই একটি অনুগত তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রতি আচার্যগণের প্রবণতা লক্ষিত হয়, কেহ আত্মরতিকে, কেহ শমভাবকে, আবার কোনও আচার্য চমৎকার বা অভিমানকে এই অনুগত তত্ত্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বশেষে রসতত্ত্ব বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্তরে উন্নীত হইয়া ঔপনিষদ আত্মতত্ত্বের সহিত একাত্মীভূত হইয়া অধ্যাত্মশাস্ত্রগোচররূপে পরিণত হইয়াছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী রসতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয় আচার্যগণের এই অদ্বৈতপক্ষপাত সম্পর্কে একস্থলে বলিয়াছেন—

In the course of the development of the philosophy of *Rasa*, several attempts were made in the direction of synthesising the various *Rasas*. The more important results of such attempts were summed up in four kinds of synthesis. Firstly, there is *Karuna-synthesis* which originated from Vālmīki and found its culmination in Bhavabhūti's **"एको रसः करुण एव"** on the practical side, and in Ānandavardhana's **"शोकः श्लोकत्वमागतः"** on the theoretical side. Secondly, there is *Śānta-synthesis*, which started perhaps from the *Mahābhārata*, found its fulfilment in works like Aśvaghoṣa's *Sāriputra-parkarṇa*, Śrī Harṣa's *Nāgānanda* and Kṛṣṇa-Miśra's *Prabodha-candrodaya*, and received able advocacy on the theoretical side at the hands of the two greatest Ālaṃkārikas—Ānandavardhana and Abhinavagupta. Thirdly, there is the *Śṛṅgāra-synthesis*, which firmly rooted in human nature itself since the beginning of creation, reached its acme of spiritual refinement, on the practical side, in the self-effacing ideal of love delineated in an inimitable manner by the creative genius of great poets like Kālidāsa and Bāṇa, and, on the theoretical side, in the well-known dictum of the royal polymath, Bhoja: **"रसोऽभिमानोऽहङ्कारः श्रृङ्गार इति गीयते"**. And fourthly, there is the *Adbhuta-synthesis* which, on the theoretical side, became crystallised in the views of Nārāyaṇa and Dharmadatta referred to by Viśvanātha in his *Sāhitya-darpaṇa* and in the views of Bhānudatta as expressed in his *Rasataraṅgiṇī*; and which on the practical side, led to the production of the wonder-dominated dramatic type represented by the older *Āścarya-cūḍāmaṇi* and the later *Adbhuta-darpaṇa* of Mahādeva at the end of the seventeenth century.[১৫]

১৫ S. Kuppuswami Sastri: *Introduction* to *Āścarya-cuḍāmaṇi*: A drama by Śaktibhadra: Pp. 13-14 (Madras, 1926)। বিভিন্ন রসগুলির মধ্যে সমন্বয়স্থাপনের বিচিত্র প্রয়াস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ড. ভি. রাঘবন্ প্রণীত *The Number of Rasas* গ্রন্থের Rasa-Synthesis শীর্ষক দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু ইহা রসতত্ত্বের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে প্রতিপাদন করে নাই। উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটিতে ভারতীয় রসমীমাংসকগণের যে অদ্বৈতাভিমুখে যাত্রার ইঙ্গিত আছে, তাহা বৈদিক দেবতত্ত্বে অনেকটা heno-theism, কি বড় জোর hantheism-এর অনুরূপ মাত্র। যাহা হউক, উপরি-উল্লিখিত কয়েকটি মতবাদ এই প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া আমরা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বা pure monism -এর স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

৩

ভারতীয় আচার্যগণ শৃঙ্গার-রসকে 'আদিরস' এই আখ্যার দ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসান্তরেরও মূল যে রতিরূপ স্থায়িভাব, ইহা 'নাশৃঙ্গারী হসতি…' প্রভৃতি উক্তির দ্বারা আচার্য অভিনবগুপ্ত বহুস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। আচার্য আনন্দবর্ধনও তাঁহার 'ধ্বন্যালোক' নিবন্ধে স্পষ্টতই বলিয়াছেন—

"শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ ॥"[১৬]

'শৃঙ্গার-প্রকাশ' কর্তা ভোজরাজের হস্তে শৃঙ্গার-রস সর্বশ্রেষ্ঠ রস, এমনকি একমাত্র 'রসনীয়' চিত্তাবস্থা এবং সর্বরসের আকররূপে নিরূপিত হইয়াছে—

"শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-রৌদ্র-হাস্য-
বীভৎস-বৎসল-ভয়ানক-শান্তনাম্নঃ।
আম্নাসিষুর্দশ রসান্ সুধিয়ো বয়ং তু
শৃঙ্গারমেব রসনাদ্রসমামনামঃ ॥· ·
… … …
অপ্রাতিকূলিকতয়া মনসো মুদাদেঃ
যঃ সংবিদোঽনুভবহেতুরিহাভিমানঃ।
জ্ঞেয়ো রসঃ স রসনীয়তয়াত্মশক্তেঃ
রত্যাদিভূমনি পুনর্বিতথা রসোক্তিঃ ॥"[১৭]

বর্তমান প্রবন্ধের পরিমিত পরিসরের মধ্যে ভোজরাজ-পরিকল্পিত শৃঙ্গারাদ্বৈতবাদের যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তথাপি এই মতবাদ যে গভীর মননশীলতাপ্রসূত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শৃঙ্গারাদ্বৈতবাদের বিপরীত কোটিতে অবস্থিত শান্তাদ্বৈতবাদও অতিগম্ভীর দার্শনিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তরসের রসত্ব বিষয়ে ভরতমুনির কাল হইতেই আচার্যগণের মধ্যে পরস্পর বিসংবাদ

---

১৬ দ্র° ধ্বন্যালোক: ৩য় উদ্দ্যোত্ত, বৃত্তি. পৃ. ৪৯৮ (কাশী সংস্করণ)। তু°—"শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোক্তবিভাবানুভাব-ব্যভিচারি-চর্বণারূপপ্রতীতিময়ো ন তু স্ত্রীব্যসনীতি মন্তব্যম্। অতএব ভরতমুনিঃ—'কবেরন্তর্গতং ভাবম্', 'কাব্যার্থান্ ভাবযতি' ইত্যাদিষু কবিশব্দমেব মূর্ধাভিষিক্ততয়া প্রযুঙ্‌ক্তে। নিরূপিতং চৈতদ্রসস্বরূপনির্ণয়াবসরে।"—ঐ. লোচন-টীকা।

অপি চ— "শৃঙ্গাররসো হি সংসারিণাং নিয়মেনানুভববিষয়ত্বাৎ
সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তয়া প্রধানভূতঃ।"—ধ্বন্যালোক-বৃত্তি, কারিকা ৩.২৯।

১৭ শৃঙ্গারপ্রকাশ: প্রথম অধ্যায়।

প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রেরই কোনও কোনও গ্রন্থে শান্তরসকে শৃঙ্গার প্রভৃতি অষ্টবিধ রসের সহিত একত্র উল্লেখ করা হয় নাই, তদুপযোগী স্থায়িভাব নির্বেদকেও অনুরূপভাবে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সহিত পরিগণনা করা হয় নাই। অথচ নির্বেদকে ভরতমুনি সঞ্চারিভাব বা ব্যভিচারিভাবের তালিকায় প্রথম স্থান দিয়াছেন। 'নির্বেদ' সম্পর্কে ভরতমুনির এই বিলক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গীর হেতু নির্দেশপ্রসঙ্গে আচার্য অভিনবগুপ্তপাদ বলিতেছেন—

"ইহ তাবদ্ ধর্মাদিত্রিতয়মিব মোক্ষোঽপি পুরুষার্থঃ শাস্ত্রেষু স্মৃতীতিহাসাদিষু চ প্রাধান্যেনোপায়-তো ব্যুৎপাদ্যত ইতি সুপ্রসিদ্ধম্। যথা চ কামাদিষু সমুচিতাশ্চিত্তবৃত্তয়ো রত্যাদিশব্দবাচ্যাঃ কবি-নট-ব্যাপারেণাস্বাদযোগ্যতাপ্রাপণদ্বারেণ তথাবিধহৃদয়সংবাদবতঃ সামাজিকান্ প্রতি রসত্বং শৃঙ্গারাদিতয়া নীয়ন্তে, তথা মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ কিমিতি রসত্বং নানীয়তে ইতি বক্তব্যম্। যা চাসৌ তথাভূতা চিত্তবৃত্তিঃ সৈবাত্র স্থায়িভাবঃ। এতত্তু চিন্ত্যম্। কিং নামাসৌ? তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্বেদ ইতি কেচিৎ। তথাহি—দারিদ্র্যাদিপ্রভবো যো নির্বেদঃ স ততোঽন্য এব। হেতোস্তত্ত্বজ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যাৎ। স্থায়িসঞ্চারিমধ্যে চৈতদর্থমেবায়ং পঠিতঃ। অন্যথা মাঙ্গলিকো মুনিস্তথা ন পঠেৎ। জুগুপ্সাং চ ব্যভিচারিত্বেন শৃঙ্গারে নিষেধন্ মুনির্ভাবানাং সর্বেষামেব স্থায়িত্ব-সঞ্চারিত্ব-চিহ্ননাৎ তাবত্ত্বানুভাবত্বানি যোগ্যতোপনিপাতিতানি শব্দার্থবলাকৃষ্টান্যনুজানাতি।"[১৮]

অভিনবগুপ্ত তাঁহার সুবিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থের নানাস্থলে সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে শান্তরসের রসত্বই যে শুধু স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই নহে; তিনি এতদূর পর্যন্তও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে শান্তরসই সকল রসের প্রকৃতি, সর্ববিধ রসানুভূতির মধ্যে শান্তরসের উপযোগী চিত্তাবস্থা ও আস্বাদন অনুস্যূত হইয়া থাকে—

"তস্মাদস্তি শান্তো রসঃ। তথা চ চিরন্তনপুস্তকেষু 'স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ'-ইত্যনন্তরং 'শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকঃ'—ইত্যাদি শান্তলক্ষণং পঠ্যতে। তত্র সর্বরসানাং শান্তপ্রায় এবাস্বাদো ন বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা। তন্মুখ্যতালাভাৎ কেবলং বাসনান্তরোপহিত ইত্যস্য সর্বপ্রকৃতিত্বাভিধানায় পূর্বমভিধানম্।..."[১৯]

শান্তরসে যেমন সর্ববিধ তৃষ্ণার উপশম ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাই যেমন সর্বমানবের চরম পুরুষার্থ এবং ব্রহ্মানন্দস্বভাব, সেইরূপ সবরসের ক্ষেত্রেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তৃষ্ণাক্ষয় সংঘটিত হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রসাস্বাদ অপরিপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখই সকল রসের সাধারণ প্রকৃতি, এবং তাহাই শান্তরস। শান্ত হইতেই অনুকূল বিভাবাদি নিমিত্ত সমবায়ে শৃঙ্গারাদি রসের জন্ম, আবার নিমিত্তাপগমে শান্তরসেই বিলয়। আস্বাদভেদ শুধু ঔপাধিক। রসাস্বাদের চরম অবস্থায় তৃষ্ণাক্ষয়, এবং এই তৃষ্ণাক্ষয়ের সহিত তুলনায় লৌকিক সকল সুখই অকিঞ্চিৎকর। কেননা—

---

১৮ অভিনবভারতী: ১ম ভাগ, পৃ. ৩৩১।

১৯ ঐ. পৃ. ৩৩৯। ধ্বন্যালোকের লোচন-টীকার একস্থলে অভিনবগুপ্ত শান্তরস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মোক্ষফলত্বেন চায়ং পরম-পুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ। স চায়মস্মদুপাধ্যায়ভট্টতৌতেন কাব্যকৌতুকে, অস্মাভিশ্চ তদ্বিবরণে বহুতরকৃতনির্ণয়পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্তঃ-ইত্যলং বহুনা।"—লোচন, পৃ ৩৯৪ (কাশী সংস্করণ)।

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ কিঞ্চিন্মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"[২০]

এইভাবে আচার্য অভিনবগুপ্ত শান্তরসকে সকল রসের প্রকৃতিরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ভরতমুনিরও যে এই মত অসম্মত নহে তাহা তাঁহার বচন উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৪

কিন্তু ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণ এইভাবে সর্বরসের মধ্যে একটি বাহ্য সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা রসানুভূতির ক্ষেত্রে যে বিজ্ঞান ও আনন্দঘন আস্বাদ সর্ববাদিসম্মত, তাহার এক তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত ঔপনিষদ অধ্যাত্মবাদের সহিত রসতত্ত্বের ঐকান্তিক অভিন্নত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের একটি মন্ত্রবর্ণ তাঁহাদের এই জিজ্ঞাসাকে প্রধানতঃ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেখানে আত্মাকে বলা হইয়াছে— রস-স্বরূপ :

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

কাব্য নাট্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও সহৃদয়ের চিত্তে যে রসানুভূতি সম্ভব হয়, তাহাও সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যের অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের ফলস্বরূপ, অতিরিক্ত কিছুই নহে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি সাধনার দ্বারা যোগিগণ যেভাবে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন, এবং সেই সাক্ষাৎকারক্ষণে যেমন আত্মব্যতিরিক্ত আর সকল প্রপঞ্চেরই বিলয় ঘটে এবং সেই আনন্দঘন রসস্বরূপ আত্মচৈতন্যের আহ্লাদ যেমন তাঁহাদের সমস্ত চিত্তভূমিকে প্লাবিত করে, কাব্য-গীতাদি চারুশিল্পও যথার্থ সহৃদয়ের চিত্তে অনুরূপ নির্বিকার, একতান এবং আহ্লাদঘন সাক্ষাৎকারকল্প এক বিলক্ষণ প্রত্যয়ের জনক। এবং আনন্দ বা আহ্লাদ, যাহা কোনও বিঘ্ন বা মালিন্যের দ্বারা অস্পৃষ্ট, যখন বেদান্তমতে আত্মব্যতিরিক্ত আর কাহারও ধর্মই হইতে পারে না, পরন্তু আত্মস্বরূপমাত্র, তখন শিল্পকর্মসঞ্জাত সহৃদয়ের এই আনন্দাস্বাদ আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহাই ভারতীয় আচার্যগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন —

"বস্তুতস্তু বক্ষ্যমাণশ্রুতিস্বারস্যেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। সর্বথৈব চাস্যা বিশিষ্টাত্মনো বিশেষণং বিশেষ্যং বা চিদংশমাদায় নিত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বং চ সিদ্ধম্। রত্যাদ্যংশমাদায় ত্বনিত্যত্বমিতরভাস্যত্বং চ।"[২১]

ভট্টনায়ক তাঁহার লুপ্ত নিবন্ধ 'হৃদয়দর্পণে' অভিনবগুপ্তেরও পূর্বে বলিয়াছিলেন—

"পাঠ্যাদথ ধ্রুবাগানাৎ ততঃ সম্পূরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হৃষ্যত্যন্তর্মুখঃ ক্ষণম্॥

---

২০ দ্র° ধ্বন্যালোক : ৩য় উদ্দ্যোত, বৃত্তি (পৃ. ৩৯০)। এই বৃত্তি-গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন : "অন্যে তু—
স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে।—ইতি ভরতবাক্যং দৃষ্টবন্তঃ সর্বরসসামান্যস্বভাবং শান্তমাচক্ষাণা অনুপজাতবিশেষান্তরচিত্তবৃত্তিরূপং শান্তস্য স্থায়িভাবং মন্যন্তে। এতচ্চ নাতীবাস্মৎপক্ষাদ্ দূরম্।..."—লোচন. পৃ. ৩৯১।

২১ দ্র° রসগঙ্গাধর : ১ম আনন, পৃ. ২১।

তেতো নির্বিষয়স্তাস্থ স্বরূপাবস্থিতৌ নিজঃ।
ব্যজ্যতে হ্লাদনিষ্যন্দো যেন তৃপ্যন্তি যোগিনঃ॥"[২২]

রসানুভূতিজনিত এই 'হ্লাদনিষ্যন্দ' যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' তাহাও 'হৃদয়দর্পণ'কারই ঘোষণা করিয়াছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের এই সিদ্ধান্তই আপন অপূর্ব মনীষার সাহায্যে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। তবে যদিও রসচর্বণাকে পরব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলা হইয়াছে বটে, তথাপি এই উভয় বিজ্ঞানধারার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণ বৈলক্ষণ্যও যে আছে, তাহাও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত কাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। কেননা, পরব্রহ্মাস্বাদ নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মসাক্ষাৎকার। অপরপক্ষে রসচর্বণায় স্বপ্রকাশ চৈতন্যের আনন্দাংশের আস্বাদসমকালেই বিভাবাদির সাক্ষাৎকারও অনুভবসিদ্ধ। সেইজন্যই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন—

"ইয়ং চ পরব্রহ্মাস্বাদাৎ সমাধের্বিলক্ষণা। বিভাবাদিবিষয়সংবলিত-
চিদানন্দালম্বনত্বাৎ। ভাব্যা চ কাব্যব্যাপারমাত্রাৎ।"[২৩]

এইভাবে যদিও ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত পরব্রহ্মাস্বাদ এবং রসাস্বাদের মধ্যে প্রকারগত তারতম্য কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি কবিকে যোগী হইতে সমুচ্চ আসন দান করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচনটীকায় 'হৃদয়দর্পণ' হইতে ভট্টনায়কের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যোগিগণ যে ব্রহ্মানন্দরূপ রস পান করেন তাহা শমদমাদিসাধনোপার্জিত; পরন্তু কবিগণ বাগ্‌দেবীর অর্চনার দ্বারা যে দিব্য আনন্দরস আস্বাদনে সমর্থ হন, তাহা অযত্নলভ্য। ধেনুর নিকট হইতে বৎস সন্তানস্নেহে স্বত-উৎসারিত যে ক্ষীরধারা পান করে, তাহার সহিত গোপকর্তৃক ক্লেশোপার্জিত দুগ্ধধারার আস্বাদের যেমন তুলনা হয় না, বাগ্‌দেবীর সন্তানরূপ কবিগণকর্তৃক অক্লেশাস্বাদিত দিব্য আনন্দরসের সহিতও সেইরূপ যোগিগণকর্তৃক আস্বাদিত পরব্রহ্মাস্বাদের তুলনা হয় না।[২৪] বস্তুতঃ,

২২ মহিমভট্টকৃত 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থের ১ম বিমর্শে উদ্ধৃত। দ্র° 'ব্যক্তিবিবেক', পৃ. ৯৪ (কাশী সংস্করণ)। যদিও এইস্থলে ভট্টনায়কের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তথাপি এই দুইটি শ্লোক ভট্টনায়কের লুপ্ত নিবন্ধ হইতেই উদ্ধৃত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। **অপি চ তুলনীয়ঃ** "This monistic idea is seen in the system of the Kashmerian writers as developed and followed by most Ālaṃkārikas. The idea of aesthetic Rasa being equal to Brahmāsvāda is spoken of by all writers, Bhaṭṭa Nāyaka, Abhinavagupta and all the followers of the latter."—V. Raghavan: *Bhoja's Śṛṅgāra Prakāśa*, Vol. I, Part II, p. 507 (Karnatak Publishing House, Bombay).

২৩ দ্র° রসগঙ্গাধর: ১ম আনন, পৃ. ২৭।

২৪ 'সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু—' (ধ্বন্যালোক ১.৬)—এই ধ্বনিকারিকার ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—'সরস্বতীতি। বাগ্‌রূপা ভগবতীত্যর্থঃ।...নিঃষ্যন্দমানেতি। দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্নুবানেত্যর্থঃ। যদাহ ভট্টনায়কঃ—

বাগ্‌ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্‌ বালতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্‌ দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ।

তদাবেশেন বিনাপ্যাক্রান্ত্যা হি যো যোগিভির্দুহ্যতে।..."—লোচন, পৃ. ৯১-৯২।

তু° "Poets are Nature's favourite children. She yields her secrets to them more readily than to others. The best part of her gifts is given to them, even as the cow, as it is said, yields the best part of the milk to the calf."—M. Hiriyanna: *The Indian Conception of Values.*

আনন্দমাত্রই ব্রহ্মানন্দস্বভাব, সে-আনন্দ যোগজ সমাধির দ্বারা অভিব্যক্ত হউক, কাব্য-বর্ণিত বিভাবাদির দ্বারা অভিব্যক্তই হউক, অথবা লৌকিক অনুকূলবেদনীয় সুখাদি-সমুত্থই হউক— ইহাই বেদান্তদর্শনের চরম সিদ্ধান্ত। তবে যে এই সকল আনন্দব্যক্তির আস্বাদনের মধ্যে প্রকারগত অথবা প্রকর্ষগত তারতম্য অনুব্যবসায়সিদ্ধ, তাহা শুধু অভিব্যঞ্জক সামগ্রীর ভেদনিবন্ধন। অভিব্যঙ্গ্য সচ্চিদানন্দস্বভাব রসস্বরূপ পরমাত্মার তাহার দ্বারা কোনও প্রভেদ সিদ্ধ হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী বিদ্যানাথপ্রণীত 'প্রতাপরুদ্রীয়যশোভূষণ' নামক অলংকারনিবন্ধের ব্যাখ্যায় ভট্ট নরহরির যে মত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"...অত এবায়ং ব্রহ্মানন্দ এব। ইয়াংস্তু বিশেষঃ। ব্রহ্মানন্দো যোগগম্যঃ। অয়ং তু বিভাবাদ্যনুসন্ধানগম্য ইতি। ইদমপি তেনৈবোক্তম্—'সর্বত্রৈকৈবানন্দব্যক্তির্লৌকিকং সুখমিতি ব্যবহ্রিয়তে। অলৌকিকবিভাবাদ্যভিব্যক্তা কবিসময়প্রসিদ্ধ্যনুসারাদলৌকিকো রস ইতি কথ্যতে। নানাবিধবিমলকর্মনির্মলান্তঃকরণেষু শমদমাদিসাধনসম্পন্নেষু শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-পরেষু পরমযোগিষু নির্বিকল্পকসমাধ্যভিব্যক্তা ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ঈশ্বর ইতি শব্দ্যতে—ইতি। উক্তং চ 'স্বাত্মযোগপ্রদীপে'—

যা স্থায়িভাবরতিরেব নিমিত্তভেদা-
চ্ছৃঙ্গারমুখ্যনবনাট্যরসীভবন্তী।
সামাজিকান্ সহৃদয়ান্ নটনায়কাদীন্
আনন্দয়েৎ সহজপূর্ণরসোঽস্মি সোঽহম্॥"[২৫]

'ধ্বন্যালোকে'র তৃতীয়োদ্দ্যোতের বৃত্তিগ্রন্থে আচার্য আনন্দবর্ধন—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা দৃষ্টিঃ"

এই শ্লোকে পরমেশ্বরভক্তির যে অনুপম আনন্দরূপতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর গুপ্তপাদের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি এইপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য—

"এবং প্রথমমেব পরমেশ্বরভক্তিভাজঃ কুতূহলমাত্রাবলম্বিত-কবি-প্রামাণিকোভয়বৃত্তেঃ পুনরপি পরমেশ্বরভক্তিবিশ্রান্তিরেব যুক্তেতি মন্বানস্যেয়মুক্তিঃ। সকল-প্রমাণ-পরিনিশ্চিত-দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ সুখং, যদপি বা লোকোত্তরং রসচর্বণাত্মকং, তত উভয়তোঽপি পরমেশ্বরবিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্রকৃষ্যতে ; তদানন্দবিপ্রুণ্মাত্রাবভাসো হি রসাস্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগস্মাভিঃ॥"[২৬]

অতএব অভিনবগুপ্ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে লোকোত্তর রসচর্বণাত্মক সুখই হউক, অথবা প্রামাণিকগণের তত্ত্বদর্শনজনিত সুখই হউক, বা লৌকিক যে কোনও সুখই হউক না কেন, সকল সুখই পরমেশ্বরবিশ্রান্তি বা ব্রহ্মসমাধিসঞ্জাত আনন্দেরই 'বিপ্রুট্' বা কণিকামাত্র, অতিরিক্ত কিছু নহে। ইহাই তো উপনিষদের সারমর্ম।[২৭]

---

২৫ দ্র° *Pratāparudrīya-yaśobhūṣaṇa*: Ed. by K. P. Trivedi (Bombay Sanskrit & Prakrit Series), p. 295.

২৬ দ্র° লোচন-টীকা, পৃ. ৫১০।

২৭ তুলনায়: "........it is really the infinite whom we seek in our pleasures. Our desire for being wealthy is not a desire for a particular sum of money but it is indefinite, and the most fleeting of our enjoyments are but the momentary touches of the eternal."—Rabindranath: *Sādhanā* ('Realisation of the Infinite' শীর্ষক ভাষণ দ্রষ্টব্য)।

রসতত্ত্বের এই অধ্যাত্মশাস্ত্রসম্মত অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। কবি যদি যোগীরই সমগোত্রীয় হন, কাব্যানুশীলনাভ্যাসরত সহৃদয় যদি পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিরত মুমুক্ষু সাধকেরই সজাতীয় হন, তবে কি কাব্যনির্মাণ বা কাব্যানুশীলনও তুল্যভাবে মুক্তির সোপান ?

বিশুদ্ধ যুক্তি যে তাহাই নির্দেশ করে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।[২৮] কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কি সম্ভব ? এই জিজ্ঞাসার সমাধান কি ? এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিরিয়ানার সমীক্ষা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি Mac Gregor প্রণীত *Aesthetic Experience in Religion* নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলিয়াছেন—

> The relation between art experience and religion is considered by Indian thinkers also, and we may close this review by making a brief reference to their conclusion. To those who are familiar with Indian thought, it is clear from the account given above of the approach to mystic experience, that there is a striking resemblance between it and the three ascending steps of spiritual discipline prescribed in Indian works—*śravaṇa, manana* and *dhyāna,* which respectively stand for knowledge of God, by faith, reflection upon it and meditation with a view to transform it into direct experience. Since *rasa* or aesthetic experience also, like this final one of *jīvan-mukti,* is characterised by complete detachment and is accompanied by a unique form of delight, the two are described as similar. But there is one vital difference between them. It is the lack in the former of the knowledge of ultimate reality, which is essential to the latter (a deficiency which is made good here by assuming grades of aesthetic intuition that progressively reveal reality). To this, they trace the lapse from art experience which takes place sooner or later when, to speak generally, all the tensions of ordinary life return. There is a reversion to common life from the experience of *jīvanmukti* also ; but it can by no means, be regarded as a 'lapse', since the philosophic condition endures then, with all its expected influence upon life's conduct. In other words, there is according to the Indian view, no direct connection between aesthetic and absolute experience, as seems to be supposed here. The discipline of the fine arts, particularly of music,[২৯] is not, however, excluded from religion ;

---

২৮ তু° "*Kāvya-yoga* is also a path-way to Reality, even as *Karma-yoga,* for example."—N. Shivarama Sastry : *Aesthetic Experience* (Proceedings of the Indian Philosophical Congress, 1940).

২৯ 'সঙ্গীতদর্পণ'-কার মার্গ-সঙ্গীতকে স্পষ্টতই 'বিমুক্তি-দ' রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত মনীষী আনন্দ কুমারস্বামীর *The Nature of "Folklore" and "Popular Art"* -শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য। চিত্রশিল্পও যে কাব্যের ন্যায়ই সহৃদয়-দর্শকচিত্তে বিভিন্ন রসের উদ্রেকে সমর্থ, এবং তাহাই যে চিত্রকরের লক্ষ্য, তাহা ভোজরাজ প্রণীত 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার' নামক নিবন্ধে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্র° *Samarāṅgaṇa-sūtradhāra,* Vol. II, Ch. 82. (Gaekwad Oriental Series).

but it is explained as only a useful aid to success in meditation upon the Highest (cf. *Yājñavalkya-smṛti,* iii. 115).[৩০]

সুতরাং দেখা যাইতেছে কাব্যজন্য অলৌকিক রসাস্বাদ ও সমাধিজন্য পরব্রহ্মাস্বাদ এই দুইটিই তত্ত্বদৃষ্টিতে সগোত্রীয় হইলেও জীবনচর্যার উপর উভয়ের প্রভাবের গুরুত্ব ও স্থায়িত্ব সমান নহে এবং সেইজন্যই অধ্যাপক হিরিয়ানা এই দুইটিকে বিলক্ষণ স্তরের অনুভূতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সমাহিত যোগচিত্তেরও 'ব্যুত্থান' আছে, তখন তাঁহাকে এই বাস্তবজীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করিতে হয়, যেমন রসাস্বাদক্ষণ হইতে ভ্রষ্ট সহৃদয়কে পুনরায় লৌকিক জীবনের বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দময় রসানুভূতির কোনও রেশই কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার মধ্যে ধ্বনিত হয় না? যদি না হয়, তবে অবশ্য রসানুভূতি ক্ষণকালের নিছক ভাববিলাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু যথার্থ কাব্য বা শিল্পের আস্বাদ তো এতদূর ক্ষণস্থায়ী নয়। অন্ততঃ আমাদিগের চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও যে ব্রহ্মাস্বাদ জন্মাইয়া দিতে পারে, তাহাতেই কাব্য বা শিল্পের সার্থকতা; কেননা, সেই আস্বাদ পুনর্বার লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিত্তে জাগরূক হয়, এবং এইভাবেই বিশুদ্ধ আনন্দপদপ্রার্থী হইয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদের ধূলিমলিন এই জীবনকে উন্নত হইতে উন্নততর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে সমর্থ হই। এ বিষয়ে অধ্যাপক হিরিয়ানাই তাঁহার অন্য একটি প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য—

"The limitations of the experience of art, to which we have alluded, do not affect the conclusion that it is of the same order, as that of the ideal state ; and we may well deduce from the fact of the one the feasibility of the other. Further, art experience is well adapted to arouse our interest in the ideal state by giving us a foretaste of it, and thus to serve as a powerful incentive to the pursuit of that state. By provisionally fulfilling the need felt by man for restful joy, art experience may impel him to do his utmost to secure such joy finally[৩১]

তাহা ছাড়া এ কথাও আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে যেমন অধিকারিভেদচিন্তা অবর্জনীয়, রসশাস্ত্রেও সেইরূপ অধিকারিভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কবির কাব্যের তাৎপর্য, তাহার রসপরিণাম, সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে, যথার্থ সহৃদয়তা অপেক্ষিত। কেননা, আচার্য আনন্দবর্ধনের ভাষায়—

বৈকটিকা এব হি রত্নতত্ত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি কস্যাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ ?"[৩২]

কিন্তু সকল পাঠক বা প্রেক্ষকই তো তুল্যভাবে 'কাষ্ঠাপ্রাপ্তসহৃদয়ভাব' নন। সুতরাং তাঁহাদের সহৃদয়তার তারতম্য অনুসারে সেই রসতত্ত্বের উপলব্ধিরও যে তারতম্য ঘটিবে, ইহা তো স্বাভাবিক। উত্তম মধ্যম

---

৩০ দ্র° M. Hiriyanna : *Experience : First and Final.*

৩১ M. Hiriyanna : *Art Experience* শীর্ষক প্রবন্ধ-সংকলনের অন্তর্গত 'Art Experience—I' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য : পৃ. ২৮ (Mysore 1954)।

৩২ ধ্বন্যালোক ৩.৪৭ (বৃত্তি), পৃ. ৫১৯।

অধম— সর্ববিধ অধিকারীই যাহাতে সেই 'কাব্যামৃতরসাস্বাদ', তাহা যতই ক্ষণস্থায়ী হউক না কেন, লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই কবি কাব্য নির্মাণ করিবেন, ইহা তো আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। কেননা—"সর্বানুগ্রাহকং হি শাস্ত্রম্"। নতুবা কয়জন কবি আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথের মত বলিতে পারেন—

"আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায়
ঘাসে ঘাসে।
দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে
দিগ্‌বিদিকে ছড়ায় আমায়
কোন্ বাতাসে।"

কয়জন সহৃদয়ই বা সেই কবিবাণীকে আপন জীবনচর্যার মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কবির ন্যায়ই মুক্তির সাধনা করিতে পারেন?

বস্তুতঃ কালক্রমে যেমন কবিত্বের অবক্ষয় হইয়াছে, সেইরূপ সহৃদয়তারও হ্রাস ঘটিয়াছে। তাই বর্তমান বিশ্বের সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন ভারতীয় কাব্যমীমাংসকগণের আদর্শসম্মত কবিহৃদয়ের রসবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে না, সেইরূপ যে-কয়টি স্বল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট কবিকর্ম জন্মলাভ করিতেছে, তাহাদের অন্তর্নিহিত শাশ্বত বাণী গ্রহণ ও ধারণ করিবার মত সহৃদয় সামাজিককুলও আজ লুপ্তপ্রায়। এই নিদারুণ অমান্ধকারের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যবিচারকগণের নির্দেশ আমাদের পক্ষে দীপবর্তিকাস্বরূপ। কেননা, তাঁহারাই অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে কবি ও সহৃদয়— তাঁহারা যে স্তরেরই হউন না কেন— সমানভাবেই 'অমৃত'পথযাত্রী। কেননা, তাঁহাদের চিত্তেই, তাহা যতই কলুষ ও মালিন্যগ্রস্ত হউক না কেন, সেই সারস্বততত্ত্বের নিঃসংশয় স্ফুরণ ঘটে, যাহা ব্রহ্মতত্ত্বেরই সবিধবর্তী।[৩৪] এই ঘোষণা হয়তো অনেকের নিকট দম্ভ ও আত্মাভিমানের প্রকাশ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা ক্ষমার্হ এবং শ্রদ্ধেয়। যেহেতু —"The evil wrought by this mystical pride, great as it often is, is like a straw to the evil wrought by a materialistic self-abandonment."[৩৫]

---

৩৩ তু° "যত্তু দশরূপকং তস্য যোঽর্থস্তদেব নাট্যম্।...তস্য হৃদয়সংবাদতারতম্যাপেক্ষয়া শ্রোতৃ-প্রতিপত্তৃ-স্ফুরণং স্ফুটাস্ফুটত্বেনাতি-বিচিত্রম্।..."— অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৯১।

৩৪ তু° "সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে"— অভিনবগুপ্ত : লোচন-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণ শ্লোক।

৩৫ G. K Chesterton: *Robert Browning*, p. 202 (Macmillan's Pocket Library Edn. 1957).

সনেট রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কল্য রবিবার রাত্রে ; সাড়ে সাতটায় ;
১ 'ব্যাঙ্কশল ষ্ট্রীটে' ; ভারতীয় 'ক্লবে' ;
'ড্যিনার' ;— ব্যাপার সবই পূর্ব্ববৎ প্রায় ;
ইচ্ছা গোলযোগ করা মাত্র মিলে সবে।
কদিনেরই বা জীবন ! তাও অনিশ্চিত।—
ঠিক্ নেই চলে' যায় কোথায় কে কবে !
আমোদটা যে এ ঘোর অর্থশূন্য ভবে
যত করে' নিতে পারে তত তার জিত।
কেহ পায় সে আমোদ দোলদুর্গোৎসবে ;
কেহ নৃত্যগীতবাদ্যে ; কেহ বন্ধুসহ
নম্র 'ড্যিনারে'র মৃদুতর কলরবে।
আমরা শেষোক্ত।— তবে করে' অনুগ্রহ
আমাদের এই অতি সাধু মতলবে
রবিবাবু— আপনার যোগ দিতে হবে।

ভবদীয়
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা

অজিত দত্ত

কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ, ১৮৬৩ সালের ১৯ জুলাই দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে কিঞ্চিদধিক দু বৎসরের ছোটো ছিলেন। বয়ঃকনিষ্ঠ যে দুজন মাত্র সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব বিশেষ লক্ষ করা যায় না, তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল এবং প্রমথ চৌধুরী। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ অন্য কোনো সমসাময়িক সাহিত্যিকের, বিশেষত কবির, নাম মনে পড়ে না যাঁর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত। প্রমথ চৌধুরী একাধিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা হলেও তিনি কবি-উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; কারণ এই তীক্ষ্ণধী সাহিত্যিক জানতেন যে তাঁর ছন্দোবদ্ধ রচনাগুলি কবিত্ব-সমৃদ্ধ নয়, এবং পাঠকমাত্রই জানেন যে সেগুলির উপভোগ কবিত্ব-নিরপেক্ষ। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সে হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালই তৎকালীন একমাত্র কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের নিকটে থেকেও এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুরাগী হয়েও স্বকীয় কাব্যরচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব আত্মসাৎ করেন নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রবিরোধী বলে সুপরিচিত হলেও তিনি যে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যে নাটকের আসর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বহু বৎসর সজীব থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রাথমিক প্রেরণা জুগিয়েছিল, কিছুকাল দ্বিজেন্দ্রলাল সে আসরে নিয়মিত যোগদান করতেন। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্য সম্পর্ক ছিল। 'বিরহ' নামে প্রহসনটি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীতও হয়েছিল। দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির উক্তি উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, এককালে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ— উভয়েই পরস্পরের একান্ত গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল। প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রকাব্য আক্রমণ করার পরেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, তার প্রমাণ দ্বিজেন্দ্রলালের বিবিধ উক্তিতে ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায়। তবু যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, তার কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। বস্তুতঃ মেজাজ ও মনোভঙ্গিতে বা poetic temperament-এ এই দুই সমসাময়িক কবি যেন কাব্যলোকের দুই সীমান্তবাসী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কবিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তাঁর বিশিষ্ট মনোভঙ্গি ও তাঁর কবিত্বের প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে কবিত্বের অনুভূতি, এমনকি অনুভূতির প্রবলতা ছিল। যা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুলভ নয়। ভাবপ্রবণ অনেক কবির ক্ষেত্রে যা ঘটে, অনুভূতির তীব্র বেগে কাব্যের বাঁধুনি বা শিল্প ক্ষুণ্ন হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে সেরূপ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা, প্রথমত তিনি ভাবপ্রবণ ছিলেন

না, দ্বিতীয়ত কাব্যশিল্পের সকল কলাকৌশল তাঁর সহজায়ত্ত ছিল। 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের কিছু সংখ্যক অপরিণত রচনা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় সকল কবিতায় শব্দ ধ্বনি ছন্দ ও মিল এরূপ সুশৃঙ্খল সমন্বয়ে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে যে, কবিতাগুলি অতিশয় অবলীলাক্রমে লিখিত বলে ধারণা জন্মে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার এই সহজ সাবলীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরূপ একজন কবি, যাঁর আবেগ সত্য ও আন্তরিক, প্রকাশ সহজ ও সবল, শিল্পকৌশল করায়ত্ত, তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যে মহত্তর স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন না কেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে। প্রথমত রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভার অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি অন্যান্য সমসাময়িক কবির মতো দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রতিভাকেও কিছুটা প্রচ্ছন্ন করেছে। দ্বিতীয় কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং। নাট্যকাররূপে তিনি যে বিপুল খ্যাতি ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু, তৃতীয় এবং সর্বাধিক প্রবল কারণ বোধ হয় এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতাই তাঁকে পাঠক মনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে স্থায়ী হতে দেয় নি, নদীস্রোতে ভাসমান ফুলের মতো তা ক্ষণিক প্রীতি বা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করে বিস্মৃতির দিগন্তে হারিয়ে গেছে।

২

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থগুলির রচনাক্রম এইরূপ—

আর্যগাথা। প্রথম ভাগ। ১৮৮২
The Lyrics of Ind। ১৮৮৬
আর্যগাথা। দ্বিতীয় ভাগ। ১৮৯৪
আষাঢ়ে। ১৮৯৯
হাসির গান। ১৯০০
মন্দ্র। ১৯০২
আলেখ্য। ১৯০৭
ত্রিবেণী। ১৯১২

এই আটখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে *The Lyrics of Ind* আমাদের বর্তমান আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অপর সাতখানির মধ্যে 'আর্যগাথা' দুই ভাগ ও 'হাসির গান'-এর রচনাগুলিতে কবি সুরসংযোগ করেছিলেন। 'আষাঢ়ে' বইটি ছন্দোবন্ধে রচিত হলেও গ্রন্থকার এটিকে 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলে বর্ণনা করেছেন। 'মন্দ্র' 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'ই শুধু কবিতাপুস্তক বলে বর্ণিত হয়েছে। প্রকারভেদ সত্ত্বেও ছন্দোবন্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলালের সাতখানি বইই তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় বহন করে।

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ কবির উনিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় কবি এ রচনাগুলিকে গীত বলে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এগুলির রসোপভোগ সুরের উপর নির্ভরশীল নয়, কারণ, "গীতগুলি শ্রুত অপেক্ষা অধিক পঠিত হইবে" এই অনুমানে কবি এগুলির পাঠযোগ্যতার প্রতিই বেশি লক্ষ রেখেছিলেন। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রধান পার্থক্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ সুরকে ব্যবহার করেছিলেন ভাষাকে

অতিক্রম করে "এক অনির্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার" করে দেবার জন্য। ছন্দ সম্বন্ধেও যে রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন, এ কথা তাঁর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় স্পষ্টতই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে, শব্দ তার অর্থমাত্র দ্বারা যে কথা প্রকাশ করতে পারে না, ছন্দ এবং ততোধিক পরিমাণে সুর— তা অভিব্যক্ত করে। "আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে" কথা-ক'টির গূঢ়ার্থ তাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দকে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নি। তাঁর গানের সুর গানের শব্দার্থকে ব্যঞ্জিত করে না। সে শুধু শব্দার্থকে কর্ণমনোহররূপে উপস্থিত করে। তার কারণ, দ্বিজেন্দ্রলাল সুর-দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত আবেগকে প্রকাশ করবার প্রয়াস করেন নি। তাঁর গানের বক্তব্য শব্দার্থেই পরিপূর্ণরূপে এবং স্পষ্টরূপে প্রকাশিত। তা সম্পূর্ণরূপে পাঠক বা শ্রোতার মনে প্রকাশিত হবার জন্য ছন্দ বা সুরের অপেক্ষা রাখে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুর ও কবিতার ছন্দ যতই সুন্দর হোক, তা তাঁর কাব্যভাষার সহচর মাত্র, সে ভাষার সঙ্গে একাত্ম নয়। এই কারণে, তাঁর গানগুলির উপভোগ সুর-নিরপেক্ষ। 'আর্যগাথা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই অন্যভাবে উল্লেখ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি পাঠেই সম্পূর্ণ উপভোগ্য। তাই কবিতা হিসাবেই সেগুলির আলোচনা করা যেতে পারে।

'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের কবিতাগুলি অপরিণত বয়সের রচনা হলেও তার মধ্য থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি "প্রকৃতিবিষয়িণী গীতি"সমষ্টি। প্রকৃতিসৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য দেখে, কবির মনে যেসকল ভাব উদিত হয়েছিল, 'আর্যগাথা'য় সেগুলি ছন্দোবদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির বিবিধ রূপে মুগ্ধ হয়ে সেই রূপগুলিকে কবি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন। বর্ণনাগুলি সুলিখিত ও সুন্দর, কিন্তু তা যথাযথ। কবির চোখ দিয়ে এইসব প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করে পাঠকমন জিজ্ঞাসু হতে পারে যে এ কবিতা পড়ে— "চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা ?" এ জিজ্ঞাসার উত্তর বোধ হয় এই যে, কবি তাঁর ভাবটুকু সম্পূর্ণরূপে ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন ; তা ভাষার চেয়ে গভীর নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাবগুলি সুন্দর, কিন্তু সে ভাবে আকুলতা নেই ; তাঁর শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝংকার অপূর্ব, কিন্তু তা বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে না ; তাঁর সৌন্দর্য-উপভোগ ইন্দ্রিয়ে সীমাবদ্ধ— অতীন্দ্রিয়লোকে বিহার করে না বলে তা পাঠকের চক্ষুকর্ণকে তৃপ্ত করেই থেমে যায়, পাঠকমনে তার অনুরণন রেখে যায় না। অথচ, 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগের অপরিণত রচনাগুলিতেও সৌন্দর্যের অভাব নেই। এবং সে সৌন্দর্য কবির অভিজ্ঞতা-গোচর ছিল। কেননা ভূমিকায় কবি নিজেই বলেছেন যে, "প্রকৃতি-সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া" তিনি এইসব গীতি রচনা করেছিলেন। কবির অনুভূতিপ্রসূত আন্তরিক এই ভাবগুলি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাকে আলোড়িত করতে না পারার কারণ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টি প্রকৃতির শোভা যথাযথ ভাবেই নিরীক্ষণ করেছে, কিন্তু সেই শোভা অন্তরে যে ভাব উৎসারিত করেছে তা গভীরভাবে অনুধাবন করে নি। সেই হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টি কিছু পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংঘাতে হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া জাগে, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে তারও প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু সে অনুভূতি এরূপ গভীর স্তরের নয় যা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। অপর দিকে ভাষা ও ছন্দের উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের এরূপ প্রভুত্ব ছিল যে, মনের অগভীর স্তরে ভাসমান এই অনুভূতিগুলিকে তিনি অনায়াসে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাষান্তরিত করতে পারতেন। এ কারণে তাঁর কবিতায় কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিত না। ঐ একই কারণে, অপরের কবিতায় যেখানে ভাব স্পষ্টরূপে ভাষায় ধরা পড়ে নি বলে

তাঁর মনে হত, তাকে তিনি দুর্বল কবিত্ব বলে মনে করতেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতার অর্থহীনতা বা অস্পষ্টতা সম্বন্ধে তাঁর অভিযোগ।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বিহারীলালের কাব্যে প্রায়ই মনের আবেগ প্রকাশে কবির অসামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যধর্ম ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর ভাবাকুলতা ছিল পার্বত্য নদীর মতো বেগবান, অপর পক্ষে তাঁর ভাষা বা বাক্‌নৈপুণ্য সে অনুপাতে দুর্বল ছিল। ঠিক বিপরীত-ধর্মী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব ছিল শান্ত, সংযত, অপ্রগল্‌ভ ; এবং ভাষা ছিল তদনুপাতে অধিক শক্তিশালী। সে কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা সর্বদাই তাঁর বক্তব্যকে নিপুণভাবে সুপরিস্ফুট করেছে, কোথাও ব্যঞ্জনার অস্পষ্টতার অবকাশ রাখে নি। আর, যে কাব্য ব্যঞ্জনা-বর্জিত, সে কাব্য মনোহররূপে উপস্থিত হলেও যে তা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে না, এ কথা ভারতীয় আলংকারিকেরা অনেকদিন আগেই বলে গেছেন।

৩

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ভাবসকল লক্ষ করলে মনে হয় যে, তাঁর মন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অপেক্ষা সামাজিক বা সম্প্রদায়গত অভিজ্ঞতায় বেশি আন্দোলিত হত। অর্থাৎ প্রেমের গভীরতায় নিমগ্ন হওয়ার চেয়ে স্বাদেশিকতার প্রবলতায় বা সামাজিক হীনতার গ্লানিতে বেশি আলোড়িত হবার প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, অন্তর্মুখীনতা অপেক্ষা বহির্মুখীনতা, ভাবালুতা অপেক্ষা বাস্তববোধ দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে বেশি প্রকট। এ জাতীয় কবিদৃষ্টি নাট্যরচনা ও আখ্যায়িকা কাব্য রচনার পক্ষেই অধিক উপযোগী, এ কথা বলা বাহুল্য। এই কারণেই, মনে হয়, 'আযগাথা'র প্রথম ভাগ বাদ দিলে তাঁর অধিকাংশ কবিতা কিছু পরিমাণে গল্প বা কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। 'আষাঢ়ে' 'মন্দ্র' 'হাসির গান' ও 'আলেখ্য' বইগুলির অধিকাংশ কবিতায় কিছু কিছু গল্প আছে। 'আষাঢ়ে' বইটিকে তো দ্বিজেন্দ্রলাল সরাসরি 'গুটিকয়েক হাসির গল্প' বলেই বর্ণনা করেছিলেন। ঐ একই কারণে তিনি নাট্যরচনায় যে সাফল্য লাভ করেছেন, গীতিকাব্যে সে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাঁর ভাবগুলি সত্য ও আন্তরিক হয়েও যে তা অগভীর বলে মনে হয়, এবং তিনি যে গভীর রসের চেয়ে সহজে লঘুরসগুলিকে বেশি সার্থক করে তুলতে পারতেন, তারও কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনোবৈশিষ্ট্যেই নিহিত বলে মনে করি। হাস্যরসের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ তুলনাহীন। সুকুমার রায়ও হাস্যরস-সৃষ্টিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছেন সত্য, কিন্তু সে হাস্যরস সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তুলনামূলক আলোচনা এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু এই কথাটুকু উল্লেখ করা যায় যে, সুকুমার রায়ের রচনার প্রধান অবলম্বন কল্পনা, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কল্পনাশক্তি সীমাবদ্ধ ছিল ও বাস্তবদৃষ্টি প্রখর ছিল বলে তাঁর সৃষ্ট কৌতুক বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশ অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতারও অন্যতম কারণ এই বহির্মুখী কবিদৃষ্টি এবং সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি প্রখর সচেতন লক্ষ। সেজন্য, তৎকালে জনমানসে প্রবলরূপে অনুভূত স্বদেশপ্রেম দ্বিজেন্দ্রকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে। এবং সমসাময়িক বাঙালিজীবনের সকল সমস্যা ও গ্লানি তাঁর কাব্যে বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কি বাঙালির চাকুরিজীবন, কি ধর্ম ও সমাজ, কি পরিবার ও

পারিবারিক সমস্যা, সবই দ্বিজেন্দ্রকাব্যে প্রেরণা জুগিয়েছে। সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক কবিতাই সাময়িক বা তারিখযুক্ত বলে গণনা করা যায়। এদিক থেকে মনোভঙ্গিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কিছুটা সাধর্ম্য ছিল, যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার শক্তি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে অনুপস্থিত।

অন্তর্মুখী দৃষ্টি অপেক্ষা বহির্মুখী দৃষ্টির আধিক্যহেতুই, মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি বা প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলি মনের গভীরতল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার স্পষ্টতার দুটি প্রধান কারণ, কবির অন্তর্মুখী দৃষ্টি বা ভাবতন্ময়তার অভাব এবং তাঁর ভাষা-নিপুণতা। কাব্যভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তি ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে তুলনাহীন। পুনরুক্তি করে বলছি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব অগভীর ও সে তুলনায় ভাষা অতি সহজায়ত্ত ছিল বলে তাঁর ভাব কখনো ভাষাকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি, বরং ভাষাই উপভোগের প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪

ভাষা ব্যবহারে দ্বিজেন্দ্রলাল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা পদ্যসাহিত্যে তা অদ্বিতীয়। এ শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় 'আষাঢ়ে' বইটিতে। এর আগে 'আর্যগাথা'য় দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্বময় রচনার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু সে প্রয়াস খুব সার্থকতা লাভ করেছিল বলা যায় না। তার কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল গদ্যধর্মী ভাষার ব্যবহারে। কবিতার ভাষা যে সর্বদাই কবিত্বময় হবে এমন কোনো কথা নেই। কাব্যভাষা যেমন বর্ণাঢ্য সুরেলা অলংকৃত বা অন্তরঙ্গ হতে পারে, তেমনি গদ্যধর্মী হতেও বাধা নেই; গদ্যের ভাষাতেও অনুরূপ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল পদ্যরচনায় যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছিলেন তা এরূপ প্রবলরূপে গদ্যধর্মী যে কবি স্বয়ং তাঁর 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলিকে সমিল গদ্য নামে অভিহিত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্যরচনার প্রধান শক্তিই ছিল তাঁর অভিনব ভাষারীতিতে। এ ভাষা যথার্থরূপে গদ্যভাষা নয়; তার প্রমাণ, দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যরচনারীতিতে বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যলেখক ছিলেন না। কিন্তু গদ্যাত্মক এক পদ্যরীতি তিনি বাংলায় সফলরূপে প্রবর্তন করেছিলেন যার বিচিত্র সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত সন্ধান করা হয় নি। সাম্প্রতিক কালে কাব্যভাষাকে মুখের ভাষার অনুরূপ করে গড়ে তোলার যে প্রবণতা আমরা বাংলা কবিতায় দেখতে পাই, সে ভাষার রীতিকে কিন্তু যথার্থরূপে গদ্যধর্মী বলা চলে না। তা বহুল পরিমাণে সুর বর্ণ ও অলংকারে সমৃদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার ভাষা ঠিক সে অর্থে গদ্যধর্মী নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের বাক্‌বিন্যাসে ও শব্দনির্বাচনেই এ রীতির চমৎকারিত্ব। এবং মনে হয় বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি শ্রেষ্ঠ দান এক অভিনব বাক্‌রীতি। এ রীতি সফলভাবে অন্য কোনো পদ্যরচয়িতা ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। প্রমথ চৌধুরীর পদ্যের ভাষাকে গদ্যধর্মী বলা হয় বটে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ তাতে কবিত্বের অভাব। কিন্তু গদ্যরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দের ব্যবহারে এবং বিন্যাসে (syntax) প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর পদ্যে কবিত্ব বিশেষ ছিল না সত্য, কিন্তু তার ভাষা গদ্যবৎ নয়। অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় কবিত্ব ছিল, কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল গদ্যের ন্যায় যথেচ্ছগামী। ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর যুগপৎ কি অসাধারণ দখল থাকলে গদ্যাত্মক পদ্যরীতিকে সফলভাবে ছন্দোবদ্ধে

ব্যবহার করা যায়, এমনকি ছন্দ ও মিলের দ্বারা চমৎকারিত্ব উৎপাদন করা যায়, তা ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। দু একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

তার যাওয়ার দু হপ্তা না হতে হতে ভাই,
বাবার ভাঙল হাত, মোদের চুরি গেল গাই ;
মায়ের হল ব্যামো, আর হেম গ্যাছে দূরে,
এমন সময় নবীন এল—

—আর্যগাথা

সে দিনটা তো গেল, পরের দিনটা এল,
তখন খুড়ীর গতর যেন একটু জোরও পেল ;
বাহির কামরা থেকে শ্রীহরিকে ডেকে,
ক্ষীণস্বরে ওষ্ঠ্যবর্ণে বল্লেন শেষে খুড়ী ;
শ্রীহরিরে পাগলামী রাখ্,—দিয়ে মন
আমার পরামর্শ টা—আর আমার কথা শোন্ ;

—আষাঢ়ে

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চরবে
কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে।

—হাসির গান

'বিশ্বাবসু' কিংবা 'এটনার' মত যদি জাগো, যদি জ্বালোই
জাগরণে প্রলয়াগ্নি, তবে যত না জাগো ততই ভালোই।

—মন্দ্র

কল্য ব'হে গেছে ঝঞ্ঝা এ শাল্মলীর উপর দিয়া,
উন্মূলিত সে শাল্মলী ভূমিতলে চুমি ;
কল্য যাহা শত হর্ম্য-বিমণ্ডিত নগর ছিল ;
বিরাট ভূমিকম্পে আজি তাহা মরুভূমি ;

—আলেখ্য

এ ভাষারীতি গদ্য ভাষারীতির অতি নিকট, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। অথচ এ রীতি নিখুঁত পদ্যরচনায় সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

পদ্যভাষা ও গদ্যভাষার আরও একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, পদ্যভাষার ধর্ম লালিত্য মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা। গদ্যের ধর্ম ঋজুতা ও বলিষ্ঠতা। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য পাঠকমাত্রই লক্ষ করে থাকবেন যে তাঁর পদ্যরচনায় প্রথমোক্ত গুণগুলির চেয়ে শেষোক্ত গুণগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় যে পৌরুষ লক্ষ্য করেছিলেন, তা এই গদ্যভঙ্গির ঋজুতার পৌরুষ। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার মধ্যে ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ইশারা ইঙ্গিতের অবকাশ নেই, তা তির্যক, সরল ও জোরালো। কারণ,

তাঁর চিন্তা কবিত্বে নিবদ্ধ হলেও, তার প্রকাশ ঘটত গদ্যরীতিতে। এই অভিনব পদ্যরচনারীতিকে কবি যে অপূর্ব কৌশলে ব্যবহার করেছেন, তা অন্য কারুর দ্বারা অদ্যাবধি সম্ভব হয় নি।

বাংলা সাহিত্যের রীতিপ্রবর্তক ও রীতিশিল্পীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারী। বোধ হয় গদ্যের পরিবর্তে পদ্যের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নূতন বাক্‌রীতি প্রবর্তন করার ফলেই এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব যথার্থরূপে অভিনন্দিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্যের প্রধান প্রধান ভাষাশিল্পীদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালকে গণনা করা এই কারণেই সংগত যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে পদ্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন তা শক্তিতে চমৎকারিত্বে ও অভিনবত্বে পূর্ব বা পর -বর্তী সকল পদ্যরীতি থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন যে, তিনি বাক্‌চাতুর্য শিখেছেন কৃষ্ণনগর থেকে, এবং কৃষ্ণনগর যে বাক্‌পটুতায় প্রধান ব্যক্তিদের জন্ম দিয়েছে, এ উক্তির উদাহরণরূপে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাম করেছিলেন। ভেবে দেখতে গেলে বাক্‌-নিপুণতায় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। বরং প্রমথ চৌধুরীর অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষারীতিতে বৈচিত্র্য বেশি। যদিও প্রধানত পদ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে, তবু এ ভাষারীতি কখনো একঘেয়ে হয়ে পড়ে নি, এবং তা কেবলমাত্র তীক্ষ্ণ যুক্তি ও উইট্‌-প্রসূত হাস্যরসেই পরিসমাপ্ত হয় নি। সে হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল সার্থক কৃষ্ণনাগরিক ছিলেন সন্দেহ নেই।

হাস্যরসকে আমরা লঘুরস বলে থাকি। কারণ, নবরসের অন্যতম হলেও করুণ ও মধুর রসের মতো এ রস অন্তরের গভীরতলে প্রবেশ করে না। কিন্তু সেজন্য উচ্চস্তরের কৌতুকহাস্য সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে করা চলে না। জগৎ ও জীবনের অসংগতিগুলি সকল লেখকের চোখে পড়ে না, সেগুলিকে অনুধাবন করবার জন্য এক বিশেষ ধরণের সূক্ষ্মদৃষ্টি প্রয়োজন হয়। এ জন্য খুব বড়ো লেখকও অনেক সময় হাস্যরসসৃষ্টিতে খুব বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন না।

হাস্যরসকে সাহিত্যে সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রবল সমাজচেতনা, সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টি এবং নিপুণ ভাষাবিন্যাস। এইসকল গুণই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাই বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় হয়ে আছেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যে অন্যান্য যেসকল হাস্যরসিক লেখক আছেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা বিদ্রূপাত্মক, সুকুমার রায়ের রচনা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী— এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। প্রমথ চৌধুরীর রচনা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উইট্‌-আশ্রিত। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, বোধ হয় লঘুতার স্তরে মনকে সীমাবদ্ধ রাখা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি -জীবনের সকল অসংগতি দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে সহজেই ধরা পড়ত, এবং অসাধারণ বাক্‌বৈদগ্ধ্যের ফলে তিনি তা নিখুঁত ভাবে তুলে ধরতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসাত্মক রচনার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কি বিদ্রূপে, কি বুদ্ধিগ্রাহ্য বাক্‌-চাতুর্যজনিত হাসি বা উইট্‌ -সৃষ্টিতে, কি নিছক কৌতুকে তিনি সমান অবলীলায় বিচরণ করতেন।

'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলির বিষয় প্রধানত সামাজিক ও পারিবারিক। জাতীয়-জীবনের বেদনা ও গ্লানি এগুলির প্রেরণা জুগিয়েছে। সে কারণে এ রচনাগুলি তীব্র বিদ্রূপাত্মক। এগুলি Ingoldsby Legends

-এর অনুকরণে গল্পচ্ছলে লিখিত, এবং এখানে হাস্যরসের সঙ্গে সামাজিক গ্লানিবোধ প্রায় সমপরিমাণে পরিবেশিত হয়েছে বলে, কোথাও কোথাও কিছুটা তিক্ততা উৎপন্ন না হয়েছে এমন নয়। কাজেই হাস্যরসাত্মক কাব্য হিসাবে এটিকে পুরোপুরি সার্থক বলা চলে না। কিন্তু তথাপি এই বইখানিতেই হাস্যরসিক কবিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বাস্তবদৃষ্টি ও প্রবল সমাজচেতনার সঙ্গে এখানে ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ প্রভুত্বের পরিচয়ও এ বইটিতেই পাওয়া যায়। 'আষাঢ়ে'র সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আলোচ্য ছন্দের প্রধান বাধা· ·তাহার সর্বত্র এক নিয়ম বজায় থাকে নাই, এইজন্য পড়িতে পড়িতে আবশ্যক মতো কোথাও টানিয়া কোথাও ঠাসিয়া কমিবেশি করিয়া চলিতে হয়।" মনে রাখতে হবে এই যে ছন্দের নিয়মভঙ্গ, এটা কবির দুর্বলতার ফলে ঘটে নি, এটি কবির ইচ্ছাকৃত। গদ্যাত্মক পদ্যরচনারীতির যে পরীক্ষা কবি এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় করেছিলেন, ছন্দ ও ভাষার উপর পরিপূর্ণ প্রভুত্ব এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় না থাকলে কোনো কবির পক্ষে সকল নিয়মের বন্ধন ছিন্ন করে সে পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল।

'হাসির গান'-এর কথা বাদ দিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে হাস্যরসের অভাব নেই। 'মন্দ্র' বইটির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, কবি এখানে নবরসকে অকুতোভয়ে এক মহলেই স্থান দিয়েছেন। 'আলেখ্য' বইটি সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। কিন্তু সর্বত্রই দেখা যায় হাস্যরসকে কবি যত সহজ নিপুণতায় সার্থক করে তুলতে পেরেছেন, অন্য রসের ক্ষেত্রে তিনি ঠিক সে পরিমাণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ, দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলা যায় যে "যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে [দ্বিজেন্দ্রলালের] তেমন অধিকার ছিল না।· · কিন্তু যাহা স্থূল, অসংগত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন।" হাস্যরসে দ্বিজেন্দ্রলালের অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয়, বলা বাহুল্য, তাঁর 'হাসির গান'এ। 'হাসির গান'এর কিছুসংখ্যক কবিতা অবশ্য তীব্র বিদ্রূপাত্মক। তাই যথেষ্ট হাসি থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ কৌতুক-রচনা বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি গান বা কবিতায় আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনের মধ্য থেকেও কবি এমন প্রবল হাসির উপকরণ খুঁজে বার করেছেন, এবং তার থেকে এমন তুমুল কৌতুক উৎপন্ন করেছেন যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যায় না। "প্রথম যখন বিয়ে হল ভাবলাম বাহা বাহা রে।" কিংবা "বুড়োবুড়ী দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।" অথবা "তার রং বড্ডই ফর্সা, তারে পাব হয় না ভরসা, তার জন্য যে কচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান্।" এগুলি সংসারের অতি সাধারণ ঘটনা ও গতানুগতিক মনোভাব। কবি এর মধ্য থেকে অদ্ভুত কৌশলে শুধু মজাটুকু তুলে ধরেছেন। এইরূপ সূক্ষ্ম কৌতুকবোধের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে মিলিত হয়েছিল ভাষা ছন্দ ও মিলের উপর অতুলনীয় প্রভুত্ব। এই উভয়ের সংমিশ্রণে উচ্ছ্বসিত হাস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এককালে দ্বিজু রায়ের হাসির গান লোকের মুখে মুখে থাকত। অধুনা কেন যে এগুলির জনপ্রিয়তা কমে গেছে তার কোনো সংগত কারণ পাওয়া যায় না। কেননা, এর চেয়ে ভালো হাসির গান যে অদ্যাবধি রচিত হয় নি, এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

নাটকের নাটকীয়তা : দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কাব্যসৃষ্টির প্রথম যুগে কাব্য গান করে শোনানো হত, অর্থাৎ কাব্যসুধা শ্রোতার কর্ণে বর্ষিত হত। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে কাব্য যখন কেবলমাত্র শ্রবণের জিনিস না হয়ে পঠনের জিনিস হল তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই কাব্যের স্বভাব গেল বদলে। নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। নাটকের আদি যুগে তাকে সর্বাগ্রে লোকসমক্ষে হাজির করতে হত। লোকে তাকে চোখে দেখত, কানে শুনত। কাব্যের মতো নাটকও পরবর্তী কালে কেবলমাত্র শ্রবণ এবং দর্শনের বস্তু না হয়ে পঠনের সামগ্রী হয়েছে। ফলে তারও স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এটি হতে বাধ্য, কারণ শিল্পবস্তু যে ভাবে মানুষের গোচরীভূত হবে তার উপরে তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করবে। শিল্প ছেড়ে দিয়ে প্রথমে খুব সহজ একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আগে চিকিৎসকরা স্টেথেস্‌কোপের সাহায্যে কানে শুনে রোগনির্ণয় করতেন, এখন এক্স-রে প্লেটের সাহায্যে চোখে দেখে রোগনির্ণয় করেন। ফলে চিকিৎসাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিল্পবস্তুর রসগ্রহণে যখন যে ইন্দ্রিয়—দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি—প্রাধান্য লাভ করছে সেই অনুযায়ী শিল্পের ফর্ম এবং টেকনিকের পরিবর্তন হচ্ছে। ইদানিং বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি প্রখরতর হয়েছে। মানুষ দূরের জিনিসকে নিকটতর করে দেখছে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের শব্দ ঘরে বসে শুনছে। নাটক যা এককালে একমাত্র রঙ্গমঞ্চের জন্যই রচিত হত—এখন অনেকে তা আদৌ চোখে দেখছে না, রেডিয়োতে শুনছে কিম্বা গ্রামোফোন রেকর্ডে। এসমস্তের প্রভাব পরোক্ষভাবে শিল্পসাহিত্যের উপরে এসে পড়বেই। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে সাম্প্রতিক কালের বেশির ভাগ নাটক অভিনয়-নিরপেক্ষ ভাবে লেখা। ধরেই নেওয়া হয়েছে যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত না করে ঘরে বসে পড়েও এর রসগ্রহণ করা যাবে। নিশ্চয় যাবে; কিন্তু যার যেখানে স্থান সেখানে সে এক, অন্যত্র আর। গ্রীনরুমের জিনিসকে ড্রয়িংরুমে আনার ফলে ওর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দর্শক নেই বলে সাজসজ্জার জৌলস নেই, চেহারা হয়েছে আটপৌরে। শ্রোতা নেই বলে এখন আর চেঁচিয়ে কথা বলে না। বসনে এবং ভাষণে অত্যন্ত সংযত। এককথায় আধুনিক নাটক নিরাভরণ এবং মৃদুভাষী। অর্থাৎ কিনা আধুনিক নাটক যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় নয়।

এসব কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গে এইজন্য বলছি যে তিনি তাঁর নাটক মুখ্যতঃ রঙ্গমঞ্চের জন্যেই লিখেছিলেন। দর্শক এবং শ্রোতার জন্যে লিখেছেন, পাঠকের জন্যে নয়। এ কথা যে সত্য তার অন্যতম প্রমাণ—তাঁর যে দু-একটি নাটক তাঁর জীবদ্দশায় রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নি, দেখা যাচ্ছে, সে নাটক তাঁর জীবিতকালে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি। একান্তভাবে রঙ্গমঞ্চের জন্য অভিপ্রেত বলে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নাটকীয় ভঙ্গি অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকট। এই কারণে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর নাটক সম্পর্কে অতি-নাটকীয়তার অভিযোগ এনেছেন। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যে নাটকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সে কথা ভুলে গেলে নাটক এবং নাট্যকার উভয়ের প্রতি অবিচার হবার আশঙ্কা থাকে। এলিজাবেথীয়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩ - ১৯১৩

যুগের সব নাট্যকার সম্পর্কেই আতিশয্যের অভিযোগ আনা সহজ, কিন্তু ভুললে চলবে না যে সে যুগে নাটক দেখারই রীতি ছিল, পড়ার রীতি ছিল না।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নাটককে সর্বাগ্রে নাটকীয় হতে হবে। এর কারণ অতি সুস্পষ্ট— যেখানে চোখে দেখে এবং কানে শুনে কোনো জিনিসকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় সেখানে খানিকটা অঙ্গভঙ্গি দৃষ্টিগোচর এবং বাক্যভঙ্গি কর্ণগোচর হওয়া প্রয়োজন। নাটকের ভাষাকে সে অনুযায়ী খানিকটা অভিনয়-অনুসারী হতে হয়। এই ভাষা এবং ভঙ্গিকেই আজকাল আমরা নাটকীয় বা theatrical বলে অপবাদ দিচ্ছি।

'নাটকীয়' কথাটিকে আজকাল এমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন যা-কিছু অসম্ভব অস্বাভাবিক এবং অসংগত তাই নাটকীয়। নাটককে সর্বদা স্বভাব-সংগতি রক্ষা করে চলতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ তাকে দেয় নি। প্রথমেই ধরুন, নাটকের জন্মকাল থেকে বেশ কয়েক শতাব্দী একাদিক্রমে কাব্য ছিল নাটকের বাহন। অথচ এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, মানুষ কথাবার্তা কোনো কালেই কবিতায় বলে নি, আজও বলে না। অথচ নাটকে ছন্দোবদ্ধ কথাবার্তা কখনোই অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। শেক্সপীয়ার-নাটকের কাব্যগুণ তাঁর নাট্যগুণের প্রধান সহায়ক। এটা খুব যদি একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হত তা হলে এই বিংশ শতাব্দীতে verse-drama পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা হত না। আমার বক্তব্য হল, নাটকের পাঠক— বিশেষ করে দর্শক— যদি তাঁর সম্ভাব্যতার ধারণাটিকে একটু ঢিলে না করে নেন তা হলে নাটকের রস পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কোলরিজ তাঁর কাব্যবিচারে যে suspension of disbelief এর কথা বলেছেন নাট্যসাহিত্য সম্পর্কেও সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গ্রীক বীর সেলুকস, মোগল সম্রাট শাজাহান কিম্বা কোনো রাজপুত রমণী যখন বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় কথা বলতে থাকেন তখনই বলতে হবে যে নাট্যকার সম্ভাব্যতার সীমাকে লঙ্ঘন করে গিয়েছেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে? শেক্সপীয়রের রোম্যান হিরোরা সকলেই এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি ভাষায় কথা বলেছেন। তাতে সে নাটকের রসসম্ভোগে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয়েছে বলে কেউ বলবে না। ভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে— প্লট বা কাহিনীবন্ধনের ব্যাপারেও কখনো কখনো সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া খুব বিচিত্র নয়। বাস্তবে এবং সম্ভাব্যে খানিকটা ব্যবধান অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবধানকেই অতি-নাটকীয়তা আখ্যা দিয়ে আমরা জাতে ঠেলবার উপক্রম করেছি।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে সাময়িক ভ্রান্তি উৎপাদনই নাট্যকারের লক্ষ্য। দক্ষ অভিনেতাও নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যটিকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেন। ভাষাবিজ্ঞানীরা জানেন, ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি hypocrite গ্রীক ভাষায় তাকে বলে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অর্থাৎ hypocrisy হল অভিনেতার (অংশতঃ নাট্যকারেরও) প্রধান গুণ। আধুনিক নাট্যসমালোচনায় ঐ hypocrisy কথাটিকেই একটু মোলায়েম করে বলা হয়েছে illusionএর সৃষ্টি। অবশ্য এই illusion সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। একদল মনে করেন অভিনয়-দর্শনকালে দর্শকরা সাময়িকভাবে বেমালুম ভুলে যাবেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই কাল্পনিক। অলীককে তাঁরা বাস্তবের সত্য বলে গ্রহণ করবেন। অপর পক্ষে ডক্টর জন্‌সন্‌ তাঁর শেক্সপীয়ার-ভাষ্যের মুখবন্ধে বলেছেন, দর্শকরা নিছক আনন্দ উপভোগের জন্যেই থিয়েটারে আসেন, তাঁরা মুহূর্তের জন্যেও ভোলেন না যে সমস্ত ব্যাপারটাই কল্পনার সৃষ্টি, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক শিথিল। নাটকের গুণাগুণ

বিবেচিত হবে 'according to its adherence to logical probability and general human nature'। কোলরিজ এই দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। তাঁর মতে দর্শক পুরোপুরি মোহগ্রস্ত নয় আবার পুরোপুরি মোহমুক্তও নয় (neither deceived nor wholly undeceived)। তিনি দর্শকের এই মনের অবস্থাকেই dramatic illusion আখ্যা দিয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত suspension of disbelief এবং অভিনেতার দক্ষতা— এই দুইয়ে মিলে dramatic illusion-এর সৃষ্টি হয়। এই ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্যে নাট্যকার এবং অভিনেতাকে যেসব চাতুর্যের (hypocrisyও বলতে পারা যায়) সাহায্য নিতে হবে তারই উপরে নির্ভর করবে নাটকের নাটকীয়তা।

অন্যান্য সব শিল্পের ন্যায় নাটকও বাস্তব বা রিয়ালিটির অনুকরণ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অনুকৃতি (imitation) এবং প্রতিকৃতি (copy) এক জিনিস নয়। অনুকরণ কথাটির মধ্যেই এই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে বাস্তব এবং তার অনুকৃতির মধ্যে খানিকটা ব্যবধান থাকতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, এই ব্যবধানটুকুই এর বৈশিষ্ট্য এবং রসসৃষ্টির প্রধান সহায়ক। বলতে গেলে এটি শিল্পের অঙ্গ। খ্যাতনামা ইংরেজ সমালোচকের মতে—'A certain quantum of difference is essential to imitation, and an indispensable condition and cause of the pleasure we derive from it'। শিল্প মাত্রই বাস্তবকে অনুসরণ করে, কিন্তু অনুসরণ করতে গিয়ে তাকে অতিক্রমও করে। বাস্তবকে ছাড়িয়ে যেটুকু, তার মধ্যেই রস। নাটকের মধ্যে ঐ অত্যাবশ্যক ব্যবধানটুকুর নামই নাটকীয়তা। অবশ্য আমাদের অতি-বাস্তব প্রাত্যহিক জীবন নাটকীয়তা-বর্জিত এমন কথা কখনোই বলব না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম দ্বন্দ্ব সন্তানবাৎসল্য, পিতা পুত্রের কলহ, ভ্রাতৃবিরোধ, আত্মীয় পরিজনের স্নেহ প্রেম ঈর্ষা বিদ্বেষ— এ সমস্তই নাটকীয় কিন্তু অতি-পরিচয়ে ম্লান। রঙ্গমঞ্চে এর পুনরাবৃত্তি দেখে আমারা তৃপ্তি পাই না যদি না এর মধ্যে আকস্মিকের বা অপ্রত্যাশিতের রোমাঞ্চ খানিকটা মিশ্রিত থাকে। যেটুকু আমাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার এবং সদাপরিচিত অভিজ্ঞতার বাইরে সেটুকুই যথার্থ নাটকীয়।

হাল আমলের নাটক (বিশেষ করে পশ্চিম দেশীয়) অতিমাত্রায় স্বাভাবিক হতে গিয়ে নিজের স্বভাবকেই বিসর্জন দিয়েছে। এসব নাটক চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবনের এমন হুবহু প্রতিচ্ছবি যে তাকে নাটক বলে চেনাই দুষ্কর। নাট্যকাররা গর্ব করে বলে থাকেন যে এর প্রত্যেকটি একটি slice of real life, অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের একটি জলজ্যান্ত টুকরো যেন নাট্যমঞ্চে ধরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলব পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের জন্য কেবলমাত্র slice of life-ই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে একটু spice of life -এর মিশ্রণ প্রয়োজন। একটু মশলা না মেশালে আস্বাদটা ঠিক আসে না। ঐ মশলাটুকুই হল আসল শিল্পরস, নাটকের বেলায় একেই বলব নাটকত্ব। আগেই বলেছি, নাটকীয়তাই নাটকের সর্বপ্রধান গুণ। নাটক যদি যথেষ্ট পরিমাণে নাটকীয় না হয় তবে সেই নাটক স্বধর্মচ্যুত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে নানা ক্রটিবিচ্যুতি আছে; বাক্যবিন্যাসে, ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে নানা স্থানে দুর্বলতা আছে, কিন্তু নাটকীয়তার অভাব নেই। সমস্তটা মিলিয়ে নাটকের যে প্রাণীন পদার্থ রোমাঞ্চ, সেটি অধিকাংশ নাটকেই তিনি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। নাটকের মূল ধর্ম তিনি বজায় রেখেছেন। তবে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। যিনি যথার্থ ধার্মিক তাঁর যেমন বাহ্যিক ভড়ং-এর প্রয়োজন হয় না, ফোঁটা তিলক না হলেও চলে, খাঁটি নাট্যকারের স্বধর্মও ঠিক সে ভাবেই পালন করতে হবে অর্থাৎ নাটকের নাটকীয়তা

প্লটের গতি এবং পরিণতির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে হবে। ভাষার কারসাজি দিয়ে প্রকাশ করলে চলবে না। ঘটনার অমোঘ বিধানে যে অবস্থার উদ্ভব হবে ভাষা তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষণে ক্ষণে ওজস্বিনী ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন যদিচ ঘটনার সংস্থানে তার প্রশ্রয় নেই। একটা ঝঞ্ঝা, একটা জলোচ্ছ্বাস, একটা ভূমিকম্প!— ইত্যাকার গুরুগম্ভীর শব্দপ্রয়োগে বক্তব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়। নাটকীয়তা এবং নাটুকেপনা এক জিনিস নয়। বাক্‌চাতুর্য ভালো, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা হয় ছ্যাবলামো। নাটকীয়তা খুবই স্বাভাবিক জিনিস, নাটুকেপনা তার ছ্যাবলা সংস্করণ।

স্থানে স্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় আতিশয্য আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবে এরও সপক্ষে একটি কথা বলবার আছে। ঘরে বসে পড়তে গেলে এ ভাষা যতখানি বিসদৃশ মনে হয়, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার মুখে ততখানি মনে হবে না। আতিশয্য-দোষ শেক্সপীয়ারের নাটকেও লক্ষণীয়। কাব্যামৃত স্থানে-অস্থানে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। বেন্ জনসন্ এই ত্রুটির কথা সে যুগেই উল্লেখ করেছিলেন। নিজে এ বিষয়ে উন্নততর টেকনিকের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে—তথা সাহিত্যিকের পক্ষে— টেকনিক একমাত্র রক্ষাকবচ নয়। পুডিংএর ভালো-মন্দ খেয়ে তবে বিচার। আমরা শেক্সপীয়ার পড়ে যতখানি আরাম পাই বেন্ জনসন্ পড়ে কি ততখানি পাচ্ছি? রঙ্গমঞ্চে বেন্ জনসনের নাটক আজ বিরলদর্শন। শেক্সপীয়ার যে পাঠক এবং দর্শক উভয়ের কাছে আজ পর্যন্ত সমাদৃত সে তাঁর কবিত্বের ঐশ্বর্যে, বলা যেতে পারে তাঁর আতিশয্যের ঐশ্বর্যে। একজন আধুনিক নাট্য-সমালোচকের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—'What is it we notice if we pick up a modern play after reading Shakespeare or the Greeks? Nine times out of ten it is the *dryness* —I do not mean the *dullness*, but the modesty of the language, the sheer lack of winged words, even of eloquence'।

সব জিনিসকে কেটেছেঁটে বাদ ছাদ দিয়ে ন্যাড়া করবার একটা চেষ্টা আধুনিক টেকনিক বলে সমাদৃত হচ্ছে। কবিতা থেকে কবিত্ব বর্জন করতে হবে, নাটক থেকে নাটকীয়তা! If the salt have lost his savour wherewith shall it be salted? নুনের যদি নুনত্ব না থাকে তবে নুনের স্বাদ কোথায় পাব? কবিত্বহীন কবিতা, নাটকীয়তা হীন নাটক আমাদের কোন্ কাজে লাগবে?

দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনভাষ্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্যপ্রত্যয়ে ও কাব্যরীতির অভিনব কর্ষণায় বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্য-ভূমিতে সেদিন আপন কবিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যখন প্রধানত নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনও তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে তাঁর রচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেম ও সৌন্দর্যস্বপ্নের রোমান্টিক গীতিকাব্য, হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যসংগীত, অভিনব ছন্দ ও কাব্যরীতি, বিচিত্রধর্মী নাটক ও প্রহসন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতি বিচিত্রকীর্তি তাঁর শিল্পজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পজীবন আলোচনা করতে হলে তাঁর দেশ-কাল ও ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং এই পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্যসাধনাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষত, দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে এর স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। তাঁর কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন একই বিধাতার রচনা, একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। দান্তের কাব্যপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন : "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন— কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"[১]

২

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান। কার্তিকেয়চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের উপর তাঁর পিতার প্রভাব কম নয়। সুকণ্ঠ গায়ক, সুরসিক তেজস্বী ও উন্নতচরিত্র কার্তিকেয়চন্দ্র তৎকালের কৃষ্ণনাগরিক সমাজে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত'-এর আদর্শে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' নাম দিয়ে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামে একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্তিকেয়চন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, "আত্মীয়স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এসকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি দেশহিতৈষী, স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়া-

---

১. কবিজীবনী : সাহিত্য।

ছিলেন।"[২] চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, সংগীতানুরাগ প্রভৃতি গুণ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। এই চরিত্রের আদর্শেই তিনি দুর্গাদাস চরিত্রটি এঁকেছিলেন। দুর্গাদাস নাটকের উৎসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছেন, "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব ৺কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

সেকালের কৃষ্ণনগরে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনটি ছিল কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতির ও সংগীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমার সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মধুসূদন প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কীর্তিমানদের সঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। এঁদের অনেককেই বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।[৩] অল্পবয়সে তিনি সংগীতচর্চাও শুরু করেন। সেকালের কৃষ্ণনগরের সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "··দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ ও সংগীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালা হিন্দী দু-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাসমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধহয় কণ্ঠসংগীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন।"[৪]

দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতারাও সকলে কৃতবিদ্য ছিলেন। 'সেজদা' জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, 'রাঙাদা' হরেন্দ্রলাল রায় ও 'রাঙাবৌদি' মোহিনীদেবীর উৎসাহবাক্য দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। বড়দা রাজেন্দ্রলাল রায় ও সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, "বড়দাদা এবং সেজদাদা আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।"[৫] জ্ঞানেন্দ্রলাল সুলেখক ছিলেন। তিনি তৎকাল-প্রচলিত সুরভি, পতাকা, Telegraph, Bengalee প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। হরেন্দ্রলাল রায় নবপ্রভা নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মোহিনীদেবী সুলেখিকা ও প্রতিভাশালিনী গায়িকা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভগ্নী। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলিতি গানের ভক্ত হয়ে ওঠেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারই নাকি তাঁকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল দেওঘরে সন্ধ্যা নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।"[৬]

---

২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (ভাদ্র ১৩৬২), পৃ ৩০।

৩. "মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ কৌতূহলী হইয়া দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহাকে কবিতা পাঠে উৎসাহিত করিতেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ ১০।

৪. আত্মকথা, পৃ ৩০।

৫. দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায় চৌধুরী, পৃ ৭১।

৬. আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭।

এম্. এ. পাস করার পরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট্ স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাতযাত্রা করেন (এপ্রিল ১৮৮৪)। তিনি তাঁর প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতাকে 'বিলাতপ্রবাসী' নাম দিয়ে পতাকা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।[৭] নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, হাস্যপরিহাস-প্রবণতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, স্বদেশ ও স্বজাতি -প্রীতি, চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রভৃতি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। বিলাতপ্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দি লিরিক্‌স অব্ ইণ্ড' নামে একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যেও তাঁর প্রতিভার গীতিধর্মিতা ও সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে।

বিলাতপ্রবাসকালে বিলিতি গান শিক্ষা ও ইংরেজি কাব্য রচনা করা দ্বিজেন্দ্রজীবনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নাট্যরচনার আকাঙ্ক্ষাও সেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক শৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addisonএর Cato এবং Shakespeareএর Julius Caesarএর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চেও বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় হইয়া উঠে।"[৮]

তিন বছর পরে তিনি বিলাত থেকে ফিরে এসে সরকারি কার্যভার গ্রহণ করেন। বিলাত যাওয়া তখনকার রক্ষণশীল সমাজে ঘোরতর অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কেউ কেউ তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। সামাজিক উৎপীড়ন দ্বিজেন্দ্রলালের তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই প্রতিক্রিয়ার বহ্নিজ্বালাময়রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'একঘরে' নক্‌শায়। নক্‌শাটির সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই— লেখক নিজেই সংযমের শাসন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একদিক থেকে এর তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। নক্‌শাটিতে দ্বিজেন্দ্রমানসের সুপ্ত স্যাটায়ারিস্টকেই যেন আকস্মিক আঘাতে জাগিয়ে তুলেছে। সামাজিক অসংগতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে বহু হাসির গান ও প্রহসন রচনা করেন। 'একঘরে' নক্‌শায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মানসপ্রকৃতির একটি অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন।

১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের উপর সুরবালা দেবীর প্রভাব অসামান্য। সুরবালা দেবী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করল। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন, "কৃষ্ণনগরের

---

৭. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সাপ্তাহিক পতাকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ১২৯১ ও ১২৯২ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতপ্রবাসী' প্রকাশিত হয়।

৮. আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭।

কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কোনো প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।"[১]

পরস্পরবিরোধী দুটি ভাববৃত্তি দ্বিজেন্দ্রমানসলোকে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, এইখানেই তার প্রারম্ভ লগ্ন। 'একঘরে' নক্শা ও পরবর্তীকালের বিদ্রূপাত্মক কবিতায় যেমন তাঁর বহির্মুখী সামাজিক মন হাস্যে-পরিহাসে-স্যাটায়ারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে নবপরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস 'গীতিকবিতার স্ফটিক পাত্রে স্বর্ণমদিরার মতো বিহ্বল ও উজ্জ্বল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে'। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মনোলোকে দুটি ধারা প্রবহমান: আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নাতুর কবি ও অসংগতি-ক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। এই দুটি ধারা কখনো স্বতন্ত্র ধারায় সমান্তরেখায় প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনো বা এই দুই বিরুদ্ধ ধারা এক হয়ে ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রেম ও সামাজিক নির্যাতন— দুয়েরই কেন্দ্রে পত্নী সুরবালা দেবী।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানির উৎসর্গ পত্রেই কবির প্রিয়াবন্দনার সুর নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে—

নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ;— নয়
কবির নয়নে দেখা— পরিস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

'আর্যগাথা'র (দ্বিতীয় ভাগ) প্রথমাংশের কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের, কবিজায়াই তার অবলম্বন। দ্বিতীয়াংশে পাশ্চাত্য কবিদের গানের অনুবাদগুলি সংকলিত হয়েছে। ষোলো বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গ কবিতা, হাসির গান, নাট্যকাব্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচুর্যে কবিজীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্বসিত। সৃষ্টি-সাফল্যের এই চরম মুহূর্তেই এল নিদারুণ আঘাত— সুরবালা দেবীর মৃত্যু হল (২৯ নভেম্বর ১৯০৩)।

স্ত্রীবিয়োগ-বেদনা তাঁর শিল্পজীবনের পক্ষেও একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। স্ত্রীবিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি ও প্রহসন রচয়িতা। একদিকে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্যদিকে বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রহসন—এই দুয়ের টানাপোড়েনে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'আর্যগাথা' (১ম, ২য়) ও 'মন্দ্র' কাব্য ; 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' ব্যঙ্গ কাব্য ; 'কল্কি অবতার' 'বিরহ' 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন চতুষ্টয় এই কালের মধ্যেই রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্ত্রীবিয়োগের পরবর্তীকালেই রচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাকেই বাণীরূপ দিয়েছিল। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনাবিধুর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শূন্য হৃদয়ের হাহাকারকে যেন এই বহিরাশ্রয়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূরণ

১. নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২০।

করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-পরিবর্তনের উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—

"তারাবাই ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রীবিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয়, বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। স্ত্রীবিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ-শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমনই খুবই সম্ভব।"[১০]

দ্বিজেন্দ্রলালের চাকুরী-জীবন সুখের হয় নি। চাকুরী-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর কোনো কোনো রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি ছিলেন সদালাপী ও মজলিশী প্রকৃতির মানুষ। অনেক গুণমুগ্ধ জ্ঞানী গুণী, সংগীত ও সাহিত্য-রসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ও নানা আলোচনায় দুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে জানিয়েছেন—

"এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।··আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশসুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলামেশা ভাববিনিময় প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ— এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও !!) ব্যবস্থা থাকিবে।"[১১]

'পূর্ণিমা-মিলন' প্রায় দুবছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্পায়ু হলেও তৎকালীন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালির একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পূর্ণিমা-মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ললিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ মিলনোৎসবের জন্যই 'এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ' গানটি রচনা করেন। উক্ত অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি

১০. বাংলার কবি

১১. দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র ; দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪১০–১১

আবৃত্তি করে শোনান। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে কান্ত কবি রজনীকান্ত স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাধে কি বাবা বলি' গানখানি গেয়েছিলেন। পূর্ণিমা-মিলনের দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "শুভ্রকেশ লালে লাল" হয়ে উঠেছিল।

৪

স্ত্রীবিয়োগের পর যে দশ বছর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন (১৯০৩-১৯১৩) তাকে প্রধানত নাটক-রচনার যুগ বলা যায়। 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) ছাড়া এ যুগের অধিকাংশ রচনাই নাটক ও প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিই মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ-দীপ্ত মুহূর্ত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব বিকাশের অনুকূল উপাদান ছিল। তা ছাড়া, অতীতাশ্রয়ী ঐতিহাসিক রোমান্সকে চিত্রময় ভাষায় ও আবেগদীপ্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করা হয়েছে।

স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এই সময় বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই ক্লাব কালক্রমে 'সুরধামে' স্থাপিত হল, দ্বিজেন্দ্রলাল হলেন এর সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইভনিং ক্লাব' উঠে যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ব্যাধির জন্য এক বছর ছুটি নিলেন। কিন্তু দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩র ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২০) জন্য তিনি 'সূচনা' অংশ লিখেছিলেন, ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিল। বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' সংগীতটিও এই পত্রিকার জন্যই রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৭ মে ১৯১৩)।

দ্বিজেন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। এই দীর্ঘ বিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সেদিনের উত্তাপ উত্তেজনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ কালের সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের কাছে এ ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। এই ঘটনা থেকে দুটি সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোট হলেও সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অনেক পরে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও বিস্ময়কর স্বকীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ), 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দিগ্‌দর্শন।[১২] রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা' 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' ও 'অবাধ সাহস'

১২ 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ): সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১। 'আষাঢ়ে': ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫। 'মন্দ্র': বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯। প্রবন্ধ তিনটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

-এর কথা সশ্রদ্ধ ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল।[১৩] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটকগুলির সপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনো মন্তব্য করেন নি। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয় নি। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৯০৬) যে সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করা হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে নির্মমভাবে আক্রমণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁদি থেকে এই সম্মিলনের অন্যতম ব্যাবস্থাপক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে চিঠি লেখেন, "রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' তোমার উপরে নারাজ হইয়া এত চটিলেন কেন জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্যব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।"[১৪]

বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থটির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ্য বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তেজিত করেছিল। ১৩১১ সালে এই দুই কবির সাহিত্যিক বিরোধ যে কতদূর গড়াইয়াছিল তা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।[১৫] দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়ায় বদলি হন, তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেলা জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দুই বন্ধুর তুমুল তর্ক হত। দ্বিজেন্দ্রলাল পালিত সাহেবকে স্বমতে দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 'অস্পষ্ট রীতি'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই মনোভাবটি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[১৬] এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে কবিতাটিকে হাস্যাস্পদ করে তোলেন।[১৭]

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ'[১৮] প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ধূমায়িত বিক্ষোভকে রূপ দেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি'[১৯] প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এর প্রায় এক বছর পরে 'কাব্যের উপভোগ'[২০] নামক একটি প্রবন্ধেও তিনি তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জবাবটিও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি এক দল চেলা আমার চারপাশে তৈরি করিয়া তুলিয়াছি।··আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনো মতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারও ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।"

---

১৩ "বিরহ প্রহসনটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়।"—রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৮০।

১৪ ১৩ই মে, ১৯০৬ কাঁদি থেকে লিখিত চিঠি : দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৪৯।

১৫. দ্বিজেন্দ্রলালকে লিখিত একখানি চিঠি (২৩ বৈশাখ, ১৩২২), রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ; পৃ ২৮৩-৫

১৬. দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৯৮-৪৯৯।

১৭. একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা), সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৩।

১৮. বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩।

১৯. প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩।

২০. বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪।

কাব্যে অস্পষ্টতা অভিযোগের প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন।[২১] প্রবন্ধটির মূল আক্রমণস্থল ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রিয়নাথ সেন এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন।[২২] কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। 'আনন্দবিদায়' প্যারডি রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। স্টার রঙ্গমঞ্চে 'আনন্দবিদায়'-এর দক্ষযজ্ঞ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্য চাবুক '(সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯) প্রবন্ধ লেখেন। মৃত্যুর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এনেছিলেন: কাব্যে অস্পষ্টতা ও দুর্নীতি। দ্বিতীয় অভিযোগটির মূলে কোনো যুক্তিই ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বহু রচনায় সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'পাষাণী' রচয়িতার পক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা'র দুর্নীতি আলোচনা নিতান্ত অসংগত বলেই মনে হয়। তবে প্রথম অভিযোগটির মধ্যে তৎকালীন রবীন্দ্রবিরোধী মতবাদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যের সূক্ষ্মতর ভাব-লাবণ্য গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ তখনো রবীন্দ্রকাব্যকে আস্বাদন করার মতো কাব্যসংস্কার ও রসরুচি তৈরি হয় নি। হেম-নবীনের কাব্যসংস্কারই তখন রসাস্বাদনের মাপকাঠি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্ট ও জোরালো কাব্যের পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষের বাইরে যে অস্পষ্ট, অদেখা আর-একটি সূক্ষ্মতর ছায়াশরীরী জগৎ আছে, তাকে কাব্যে স্থান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ তাই অনেকখানি কাব্যপ্রত্যয়গত বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরাজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।"[২৩] হেম-নবীনের যুগে যে কারণে বিহারীলালের আদর হয় নি, রবীন্দ্রনাথেরও কতকটা সেই কারণেই বাংলাদেশে যথার্থ স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব ঘটেছিল।

৫

দ্বিজেন্দ্রমানস যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বলিষ্ঠ। তবু তাঁর সাহিত্যের যথাযোগ্য সমাদর ঘটে নি। সমসাময়িক কালে, বিশেষত তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে, নাট্যকার হিসাবেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর নাট্যকার খ্যাতিই কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল। নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যও হয়তো তাঁকে তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে অনেকখানি সরিয়ে এনেছিল। শেষকাব্য 'ত্রিবেণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "সম্ভবতঃ আমার খণ্ডকবিতার এই খানেই সমাপ্তি!"—এই উক্তিটি যেন তাঁর কাব্যনিয়তিরই নির্মম পরিহাস! স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি লাভবান হতে পারেন নি। সম্ভাবনা-দীপ্ত কাব্যজীবনকে অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে নাট্যসরস্বতীর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে।

২১. কাব্যে নীতি: সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।
২২. চিত্রাঙ্গদা: সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৬।
২৩. বিহারীলাল: আধুনিক সাহিত্য।

তাঁর নাট্যকার খ্যাতি যেমন কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছে, তেমনি আর-একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের কাল একই সঙ্গে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই দুই ভাবধারার বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ আরও আটাশ বছর জীবিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপস্রষ্টার দক্ষিণপাণির আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও রীতিই বাংলা কাব্যের পথ নির্দেশ করেছে। যা রবীন্দ্রকাব্যের অনুকূল নয়, তা সহজেই পরিত্যক্ত হল। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত কাব্যরীতি ও কলাবিধির সম্যক্ অনুশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবির কবিকীর্তি আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি শক্তির উৎস দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃতই পড়ে রইল।

দ্বিজেন্দ্রলালের মনে লিরিসিজম্ ও স্যাটায়ার একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। লিরিক ও স্যাটায়ারের বিপরীত আকর্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-পরিণামকে কোন্ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, দ্বিজেন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসার এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। মনোধর্মের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি' নন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই সত্যটিকে বহু পূর্বেই নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর বায়রনের কথা মনে হয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর মত বায়রনের কবিতায় কোনো সুগভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ছিল না। আবেগতপ্ত অবলীলাকৃত প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে এক বিদ্রূপাত্মক মনোভাব তাঁর কাব্যে প্রাধান্যলাভ করেছিল। 'মহতের সঙ্গে তুচ্ছ, গভীরের সঙ্গে অগভীর, করুণের সঙ্গে হাস্য— প্রভৃতি আপাতবিরোধী ভাববৃত্তিগুলি তাঁর কাব্যে ওঠা-নামা করেছে।' বায়রনের মত দ্বিজেন্দ্রলালেরও অন্তর্মুখী গতিপ্রবণতার সঙ্গে বহির্মুখী সামাজিক মনের একটি মিলন ঘটেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যরীতি ও ছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছিলেন। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, গদ্যাত্মকভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, "তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি সমাবেশ ঘটেছে।"[২৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত কবি হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তখন বাংলা নাটকের একচ্ছত্র সম্রাট গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের সেই প্রবল প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল প্রতিভা রূপ-রীতি আঙ্গিক-প্রকরণ চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে নূতনত্ব এনেছিল। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ণতা ও আতিশয্য-দোষ থেকে মুক্ত নন। আধুনিক নাটকের সূক্ষ্মতর শিল্পরীতি, স্বল্পায়ত রূপবিন্যাস, আধুনিক মঞ্চানুগ কলাবিধি দ্বিজেন্দ্র-নাটকে অনুসন্ধান করা সঙ্গত নয়। ব্যয়সাধ্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক নাটকের প্রবণতাও আজ অনুপস্থিত। যে নাট্যকার খ্যাতি তাঁকে সে যুগে জনপ্রিয় করেছিল, তার ভিত্তি আজ দুর্বল। কবিতা গান ও কাব্যরীতির মধ্যেই তাঁর স্বক্ষেত্র নির্ণয় করতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবান কবি সুরকার ও নাট্যকারকে যোগ্য সমাদর দেওয়ার সুযোগ এসেছে।

---

২৪. দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ : উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০।

স্বরলিপি

জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল,
এখন যদি সাহস থাকে মরণটাকে দেখবি চল।
পড়ে আছে অসীম পাথার
সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার
অঙ্গ এলে অবশ হয়ে সবাই যাবি রসাতল।
উপরে তো গর্জে ঢেউ সে
দণ্ডমাত্র নয়কো স্থির
নীচে পড়ে আছে অগাধ
স্তব্ধ শান্ত সিন্ধু নীর।
এত দিন তো ঢেউয়ে ভেসে
দিলি সাঁতার উপর-দেশে
ডুব দিয়ে আজ দেখব নীচে কতখানি গভীর জল।

কথা ও সুর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় — স্বরলিপি : শ্রীদিলীপকুমার রায়

মা । মা গরা গা I{ II মা মা -া । পা পা -া I মগা মা -া । পা ধা -া I পধা -র্সা ণা । ধা -া । I
জী বন্ টা ০ ত দে খা ০ গে ল ০ শু ০ ধু ই কে ব ল্ কো০ ০ লা হ ০ ল্

-া -া না । না না না I র্সা র্সা -া । র্সনা র্সা -া I র্রা র্রা -র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I
০ ০ এ খন্ য দি সা হ স্ থা০ কে ০ ম র ণ্ টা কে ০

নর্সা -র্রর্সা ণা । -ধা ধা ধা I ণা ণা -া । ধা পা -া I মপা -ধপা মা । -গা গা মা I
দে০ খ্ বি ০ ওরে ম র ণ্ টা কে ০ দে০ খ্ বি ০ ওরে

ধা ধা -া । ধা ধা -ণা I পা -া ধা । পধা -র্সণা -া I -া -া ধা । পা মা গা I
ম র ণ্ টা কে ০ দে খ্ বি চ০ ০ ল্ ০ ০ জী বন্ টা ত

মা মা -া । পা পা -া I গা মা -া । পা ধা -া I পধা -র্সা ণা । ধা -া -া II
দে খা ০ গে ল ০ শু ধু ই কে ব ল্ কো০ ০ লা হ ০ ল্

II -া -া না । না না না I র্সা র্সা -া । র্সনা র্সর্সা -া I র্রা র্রা -র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I
০ ০ প ড়ে আ ছে অ সী ম্ পা ং থা র্ স বা ই তা তে ০

নর্সা -র্সর্সা র্সা । ণা ধা -া I ণা -া ধা । -পা মগা মা I পা পা -া । পক্ষা ধপা -া I
দিং ০ ছে সাঁ তা র্ অ ০ ঙ্গ ০ এং লে অ ব শ্ হং য়ে ০

ধা ধা -র্সা । ধা পমা -গা I মা ধা -া । পধা র্সণা -া I -া -া ধা । পা মা গা I
স বা ই যা বেং ০ র সা ০ তং ০ ল্ ০ ০ জী বন্ টা ত

মা মা -া । পা পা -া I গা মা -া । পা ধা -া I পধা র্সা ণা । ধা -া -া II
দে খা ০ গে ল ০ শু ধু ই কে ব ল্ কোং ০ লা হ ০ ল্

II সা -া সা । গা গা -া I মা -া মা । পা -া পা I গা -া মা । পা -া ধা I
উ ০ প রে তো ০ গ ০ র্জে ঢে উ সে দ ০ গু মা ০ ত্র

পধা -র্সা ণা । ধা -া -া I র্সা র্সা -না । র্সা র্সা -র্রা I র্সধর্সা ণা -া । ধা পা -া I
নং য়্ ক স্থি ০ র্ নী চে ০ প ড়ে ০ আং ছে ০ অ গা ধ্

মা -া গা । মা -া পা I মরা -মা জ্ঞরা । সা -া -া I না না -া । না -া না I
শু ০ দ্ধ শা ০ ন্ত সি ০ ন্ধুং নী ০ র্ এ ত ০ দি ন্ ত

র্সা র্সা র্সা । র্সনা র্সর্সা -া I র্রা র্রা -র্জ্ঞা । র্রা র্সা -া I নর্সা নর্সা -া । ণা ধা -া I
ঢে উ য়ে ভেং সে ০ দি লি ০ সাঁ তা র্ উং পং র্ দে শে ০

ণা -া ণা । ধা পমগা -মা I পা -া পা । -া মা পা I ধা ধা -র্সা । ধা পমা -গা I
ডু ব্ দি য়ে আং০ জ্ দে খ্ ব ০ নী চে ক ত ০ খা নিং ০

মা ধা -া । পধা -র্সণা -া I -া -া ধা । পা মা গা I মা মা -া । পা পা -া I
গ ভী র্ জং ০ ল্ ০ ০ জী বন্ টা ত দে খা ০ গে ল ০

গা মা -া । পা ধা -া I পধা -র্সা ণা । ধা -া -া II II
শু ধু ই কে ব ল্ কোং ০ লা হ ০ ল্

সরকারী দলিলে রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সেদিনকার অল্পসংখ্যক সাহিত্যিকের মধ্যে আমি ছিলেম বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সবচেয়ে কাঁচা। আমার ছন্দগুলি লাগাম-ছেঁড়া, লেখবার বিষয় ছিল অস্ফুট উক্তিতে ঝাপসা, ভাষার ও ভাবের অপরিণতি পদে পদে। তখনকার সাহিত্যিকেরা মুখের কথায় বা লেখায় প্রায়ই আমাকে প্রশ্রয় দেন নি— আধো আধো বাধো বাধো কথা নিয়ে বেশ একটু হেসেছিলেন। সে হাসি বিদূষকের নয়, সেটা বিদূষণ-ব্যবসায়ের অঙ্গ ছিল না। তাঁদের লেখায় শাসন ছিল, অসৌজন্য ছিল না লেশমাত্র। বিমুখতা যেখানে প্রকাশ পেয়েছে সেখানেও বিদ্বেষ দেখা দেয় নি। তাই প্রশ্রয়ের অভাব সত্ত্বেও বিরুদ্ধ রীতির মধ্য দিয়েও আপন লেখা আপন মতে গড়ে তুলেছিলেম।"

নিজের প্রথম পর্বের রচনার সমকালীন স্বীকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই ধারণা যথার্থ বলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং পরিণত বয়সে কবি যে-সব রচনা অস্বীকার করেছেন, অচলিত সংগ্রহের দূরত্বে যারা আত্মরক্ষা করছে, সমকালীন সমালোচকরা যে তাদেরও স্বাগত জানিয়েছিলেন এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। ভাব, ব্যঞ্জনা ও শব্দ-প্রয়োগের নবত্ব সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অবশ্য অনেকে এই নবত্বকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেছেন, বিরূপতাও দেখিয়েছেন। কিন্তু অভিনন্দনের যে অভাব ছিল না সে কথা মনে রাখতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কবিকে অভিনন্দিত করেছেন। প্রথম পর্বের রচনার উপর নির্ভর করেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সাহিত্যের আসরে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

ভারত সরকারের রিপোর্টেও রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাসূচক মন্তব্য পাওয়া যায়। সরকারী দলিলের মন্তব্য হিসাবে এদের বিশেষ মূল্য আছে। যদিও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আজ সরকারী দলিলের অনেক মতামতই বিচারসহ মনে হবে না। কোথাও কোথাও সমকালীন লেখকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার যে ভাবে তুলনা করা হয়েছে তা কৌতূহলোদ্দীপক।

ভারত সরকার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারদের প্রকাশিত বইপত্রের উপরে বার্ষিক রিপোর্ট[১] পেশ করবার নির্দেশ দেন। এই রিপোর্টে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এবং উল্লেখযোগ্য বই সম্পর্কে মন্তব্য করা হত। প্রথম রিপোর্ট সংকলিত হয় ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকের উপর ভিত্তি করে। ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত রিপোর্ট দেখেছি। এর পরেও দু-এক বছর রিপোর্ট বেরিয়েছিল বলে মনে হয়। তবে ১৯০০ সালের পরে বোধ হয় এই রিপোর্ট আর বের হয় নি।

চন্দ্রনাথ বসু বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর।[২] তিনি কাজে যোগ দেবার পর থেকে বাংলা বইয়ের উপর বিস্তৃত রিপোর্ট সঙ্কলিত হতে আরম্ভ হয়। ১৮৮০

১ এই রিপোর্টগুলি পুস্তকাকারে ছাপা হচ্ছে।

২ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার তারিখটি ঠিক নয়।

খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বৎসরে প্রাপ্ত পুস্তকের রিপোর্ট লেখেন। এটি তাঁর প্রথম রিপোর্ট। শেষ রিপোর্ট তিনি লিখেছেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বইয়ের উপরে। এই কয় বছরের সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় চন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-রচনার গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় পূর্ব হতেই ছিল। ১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক সভায় কবিতা আবৃত্তি করবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।[৩]

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কোনো বই বের হয় নি। পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত 'বনফুল' চন্দ্রনাথ বসুর রিপোর্টে স্থান পায় নি। ঐ বছর বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়াময়ী', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী' এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'ফুলবালা' প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে কিশোর কবির প্রথম রচিত কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গেল চারটি বই— 'ভগ্নহৃদয়' 'রুদ্রচণ্ড' 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'। এই বছরের রিপোর্টে প্রত্যেকটি বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। 'রুদ্রচণ্ড'কে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পৃথ্বীরাজের সংগ্রাম বাঙালী কবি ও ঔপন্যাসিকের প্রিয় বিষয়। 'রুদ্রচণ্ডে' স্বাদেশিকতার ভাবোচ্ছ্বাস নেই ; ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় অন্ধ একটি মনের কুটিল গতি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উন্মোচিত করা হয়েছে। "The best work coming under this head [drama] was a small tragedy by Baboo Rabindra Nath Tagore, entitled 'Rudrachanda'. . . . But the work under notice is not written in a spirit of sentimental patriotism. One of its principal objects is to describe the workings of a mind completely possessed by feelings of hatred and vindictiveness on account of personal wrongs ; and this object has been accomplished with remarkable success."

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অস্পষ্টতার অভিযোগ অনেক উঠেছে। সরকারী রিপোর্টে কিন্তু সমকালীন কবিদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনা স্পষ্টতর ও অধিকতর জীবনঘনিষ্ঠ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসু রিপোর্টে বলেছেন— "Vagueness is one of the principal characteristics of modern Bengali poetry. The Bengali poet's pictures of men and things are hazy and inaccurate. His men and women do not seem to be made of flesh and blood and bone ; they have no clear outline or definite movement ; they move as a mist in which it is hard to discern a true or living form. To certain poems which appeared last year this criticism, however, does not apply ; the chief among them being 'Bhagnahridaya' by Baboo Rabindra Nath Tagore. It is a love poem, like all those belonging to the school of Bengali poetry, of which Baboo Rabindra Nath is a leading representative. But the characters introduced in it look like real living beings, with mental and bodily features that may be clearly

---

৩ রবীন্দ্রজীবনী ১ম (১৩৫৩) পৃ ৫৪

distinguished. The poetry of this school deals with realities, though of sentimental kind ; and treats them in a fitting spirit and style."

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র'কে রিপোর্ট-লেখক বৎসরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী বলতে পারেন নি। চন্দ্রনাথ বসুর মতে রামকুমার ভট্টাচার্যের 'আসাম-ভ্রমণ' ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী। রবীন্দ্রনাথ বল-নাচ, থিয়েটার, গানের মজলিস, পার্টি ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন ; ভ্রমণকাহিনীতে যে-সব মূল্যবান তথ্য জানবার আশা পাঠকরা করেন 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' তা নেই। সুতরাং এটি "not so valuable a work as Baboo Ramkumar's book…". তথাপি 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র কিছু গুণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে : "But, although very far from possessing the best features of a book of travels, Baboo Rabindra Nath's work gives ample evidence of descriptive power and capacity for observation, combined with a talent for humorous and caustic writing which is rare among Bengali authors."

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম সংস্করণে লেখকের নাম ছাপা হয় নি। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয় টীকায় বলা হয়েছে: "ইহা ১৮০২ শকের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্ভবতঃ বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষে অভিনীত গীতিনাট্যটির প্রোগ্রাম-হিসাবে।…আন্দাজ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়। পুস্তকটিও এই দিনে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।" শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন: "বিদ্বজ্জনসমাগম সভা উপলক্ষে উহার প্রথম প্রকাশ ও অভিনয় হয়।"[৪]

ড. সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, শনিবার ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রথম অভিনয় হয়েছিল।[৫] কিন্তু বইটির প্রথম প্রকাশের তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১।[৬] সুতরাং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ের আগেই বেরিয়েছে এবং শুধু যে অনুষ্ঠানপত্র হিসাবে নয়, পৃথক বই হিসাবেই এর অস্তিত্ব ছিল এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি কারণে। সরকারী দলিলে প্রথম সংস্করণের লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই। সেখানে লেখক ও বইয়ের স্বত্বাধিকারী হিসাবে নাম আছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। এটা সরকারী দপ্তরের ভুল নয়। আইন অনুসারে প্রকাশককে বই সম্বন্ধে সকল তথ্য লিখে পেশ করতে হয়। প্রকাশক ছিলেন প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। বিদ্বজ্জন সমাগম সভার প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম লেখকরূপে দেওয়া অসম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নাম ছাপা না হওয়ায় এই ভুল করা আরও সহজ ছিল। কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে পরিচিত থাকা সত্ত্বেও 'বাল্মীকি-প্রতিভা' প্রকাশ ও অভিনয়ের বছরখানেক পরেও প্রকৃত লেখকের সন্ধান পান নি। তিনি রিপোর্টে বলেছেন: "Valmiki Prativa by Baboo Dwijendra Nath Tagore was an exceedingly good opera published during the year under review [1881]."

---

৪ রবীন্দ্রজীবনী ১ম (১৩৫৩) পৃ ৮৮

৫ রবীন্দ্রজীবনী ১ম, ১নং পাদটীকা।

৬ বাংলা ১২৮৭ ফাল্গুন ২ শনিবার।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'বউঠাকুরানীর হাট' 'কালমৃগয়া' ও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'—এই তিনটি বই বের হয়। কিন্তু এ বছরের রিপোর্টে একমাত্র 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের'ই দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতকে' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রনাথ বসু রিপোর্টে লিখছেন: "But by far the best poetical work of the year—indeed one of the best poems yet written in Bengali—was Babu Rabindra Nath Tagore's Sandhya Sangit, a volume of love poems. The source of those poems lies deep within the author's heart. The sentiments to which he gives expression do not, therefore, seem to be empty or affected, but appear thoroughly genuine. They possess a strength, a fire as of a living and burning thing, and a vitality, which cannot possibly belong to a thing that is counterfeit. These bold, earnest and glowing expressions of a deeply felt sentiment are adorned with a wealth of imagery and cast in a mould of many coloured fancy which mark the author as a true poet, and one who, though very young, ought to be placed in the front rank of living Bengali poets."

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পরে চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অস্পষ্টতার মৃদু অভিযোগ এনেছেন: "It should be observed, however, with reference to Babu Rabindra Nath's poetry, that it is of that abstract and impersonal type which cannot be always easily penetrated, and which, as in the case of Shelley's poetry, is often considered to be rather mystical. The subject of such poetry is not love in a concrete form, or love as existing between individual lovers in a story, such as is described by the older poets both here and in England, but mere forms or modes of the sentiment of love dissociated as much as possible from all individualising circumstances of time, place and personality. . . . Babu Rabindra Nath's poetry, however good and pure in itself, may be therefore expected to give rise to an objectionable school of imitators and interpreters in this country."

'কালমৃগয়া'র মধ্যে চন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছেন "much artistic power and skill". 'বউঠাকুরানীর হাট'কে খুব সার্থক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। রিপোর্টে এই উপন্যাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"Though not very successful, was much better than most Bengali novels are."

'বিবিধ প্রসঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধপুস্তক। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য রিপোর্ট-লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে নি। রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে—"Written with great cleverness and in a distinctly original vein. Babu Rabindra Nath is not always sound, but his shrewdness, his ingenuity, his wit, his thoughts cast in a mould of playful fancy, his occasional flashes of genius, make him out as a unique and independent figure in Bengali literature. His style is also as unique as his

matter and manner. It is a poetical and figurative style, with an element of quaint humour in it which seems traceable to a strong and somewhat queer individuality."

'প্রভাতসঙ্গীতে' রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান। এর বেশি কিছু রিপোর্টে এ বই সম্বন্ধে বলা হয় নি। আগের বছরের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথের অনুকারী কবিদের হয়ত শিগগিরই দেখা যাবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সফল করেছিল সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'ঝঙ্কার'। এটি বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্যের অনুকারী প্রথম বই।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে অন্তঃসারশূন্য সমকালীন বাংলা কবিতার সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের তুলনা করা হয়েছে : "Verbose and bombastic in expression, that poetry is utterly hollow and unsubstantial, and the only idea it conveys is that they who write this poetry are mere literary mountebanks who want only to draw attention to themselves, or idle blusterer who make a noise, for the sake of noise, and not from depth or truth of thought, feeling, or character. And in this respect ordinary educated Bengali of the present time, a noisy young man who affects to know everything and to be possessed of the highest character, but who in reality knows nothing and possesses no character."

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নতুন সুর এনেছে। তাঁর কাব্যে আছে প্রাণের স্পর্শ। "There is, however, in Bengali literature poetry of a far higher kind than this, genuine poetry proceeding from genuine thought and feeling. There was enough of such higher poetry in Babu Rabindra Nath Thakur's Chhabi O Gan . . . in which sentiments of the deepest and most delicate kind is expressed in a more concrete or realistic form than it is in any of the author's previous poems."

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র আলোচনা প্রসঙ্গে রিপোর্ট-লেখক মন্তব্য করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব কবিদের রচনার তুলনামূলক বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা কঠিন। "The sentiment of love is expressed in these sonnets in forms which are at once so deep, delicate, fine, fervid, and in verses so full of the luxuriance of music and melody that it is difficult to decide who is the better sonneteer, the imitator Bhanusinha Thakur, or his model the great Baisnaba poet."

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমালোচনা করা হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার। বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করবার পর প্রশ্ন করা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর মানসিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে উঠতে পারে কি না। "It may be questioned whether a purely mental struggle can be a fit subject for dramatic composition. But there can be no doubt that it may be made the subject of the best and highest poetry. The description of the mental struggle in this book is in the highest degree poetical, and the manner in which its different stages are proportioned to each other is really dramatic. The mind of the ascetic

in all its phases is one of the noblest creations of poetry in Bengali literature, and there are . . . passages of remarkable power, beauty, and grandeur."

'নলিনী' সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে : "a creation of inexpressible tenderness."

'আলোচনা' রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গদ্য গ্রন্থ। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ বই অস্বীকার করলেও রিপোর্ট-লেখক হিসাবে চন্দ্রনাথের উৎসাহ কম ছিল না। 'আলোচনা' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : " . . . written in a style half poetic, half discursive, was one of the best Bengali books received in the year. The topics dwelt upon are of the meditative order, and they are handled in the singularly witty and original style of the author."

চন্দ্রনাথ বসুর লেখা এটিই শেষ রিপোর্ট। এর পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তাঁর প্রথম রিপোর্ট ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বইয়ের উপরে। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হয়। 'কড়ি ও কোমল'কে হরপ্রসাদ ঐ বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলতে পারেন নি। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন রাম শর্মা। হরপ্রসাদ 'কড়ি ও কোমল' সম্বন্ধে বলেছেন : "It is not possible to leave the subject of poetry for the year 1886 without saying something about that excellent collection of sonnets and humorous pieces entiled 'Kari O Komal'. . . . Though not one of his best works, it has still all the impress of his genius. The melody of his verses, and the Shelley-like idealism of his sentiments often remind the reader of his Prabhat Sangit. In 'Kari O Komal' Babu Rabindra Nath Tagore has perhaps for the first time descended occasionally from the lofty ethereal region of idealism to handle subjects of a realistic and more terrestrial nature, and his epistle to Damu and Chamu shows that he has an excellent vein for satire."

পর বৎসরের রিপোর্টে হরপ্রসাদ 'রাজর্ষি' সম্বন্ধে বলেন : "Though the closing portion of the work appears to have been rather hastily written, contains touches of genuine poetical feeling. The death of Dhruba's sister is described with much pathos."

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' এবং অন্যান্য অনেক নাট্যকারের বাস্তবানুগ নাটকের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটক কল্পলোকের কাহিনী— এই মন্তব্য করা হয়েছে 'মায়ার খেলা' সম্পর্কে। তবে এই গীতিনাট্যের একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তা হল এই : "The fairy beings, named Maya Kumaris, introduced for the first time into the Bengali drama in imitation of similar beings in Shakespeare, appear on the stage in every scene, and direct that action of the play like the witches in Macbeth."

কিন্তু 'রাজা ও রানী' অন্য শ্রেণীর নাটক। এ নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া যায়। তাই 'রাজা ও রানী' সম্বন্ধে বলা হয়েছে : "Raja O Rani has more flesh and blood, more circumstance and detail, than the previous works of Babu Ravindra Nath, and the interest is

sustained throughout. With the increase of age and experience, Ravindra Babu's works are becoming replete with human interest. His dramas when performed before a select audience by the members of his own family produce a powerful effect, but they are generally meant for the cultured few."

হরপ্রসাদের ধারণা ছিল যে সকলে রবীন্দ্রনাথের নাটক বুঝতে পারবে না— এই আশঙ্কায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকের অভিনয় হয় না।

'বিসর্জন' নাটকের মধ্যে হরপ্রসাদ একটি উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। পৌত্তলিকতা অপেক্ষা ব্রাহ্ম মতবাদ যে অধিকতর সত্য তা দেখাবার জন্য এই নাটক লেখা হয়েছে। "Bisarjan is written with consummate art. In this work the Babu [Rabindranath] has dramatized the first few, that is, the best chapters of his well-known novel, the Rajarshi ; but the plot of the drama is a great improvement upon that of the novel. . . . The book is designed to prove the truth of Brahmoism as opposed to idolatry, and the writer has attempted to show this with great cleverness."

'মানসী' ও কামিনী (সেন) রায়ের 'নির্মাল্য'কে হরপ্রসাদ পৃথক করে দেখতে পারেন নি। দুটি কাব্যগ্রন্থের মূল্যই তাঁর কাছে সমান ছিল। হরপ্রসাদ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : "Nirmalya by Miss Kamini Sen and Manasi by Babu Ravindranath Tagore, are two collections of occasional pieces by two distinguished poets of Bengal. They are on a par as regards melody of versification, sweetness of language and purity and depth of sentiment."

পরের বছরের রিপোর্টে দেখা যায় হরপ্রসাদ 'চিত্রাঙ্গদা' অপেক্ষা 'গোড়ায় গলদ' কৌতুক-নাটকটির অনেক বেশি প্রশংসা করেছেন। "The oddities and eccentricities of educated Bengalis is the theme of the work (Goḍay Galad). . . .This produces infinite amusement, and the author, with a cleverness and dexterity which is his own, takes advantage of every opportunity of entertaining his audience."

'চিত্রাঙ্গদা' হল "a love story of great merit"। এই কাব্য-নাটকে লেখক দেখিয়েছেন জীবনে মাত্র একবার প্রেমের আবির্ভাব ঘটে এবং তখনই সে রূপের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'য়ুরোপযাত্রীর পত্রে'র একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ; সেটি হল এর রচনাশৈলী—"Charmingly melodious prose".

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোক গমন করেন। কথাসাহিত্যিক হিসাবে বঙ্কিমের পরেই নাম করতে হয় রমেশচন্দ্র দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের। হরপ্রসাদ রমেশচন্দ্রের নতুন উপন্যাস 'সমাজে' রিফর্ম মুভমেণ্টের সমর্থন দেখেছেন। ঐ বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ছোটগল্প'ও নব-আন্দোলনের সমর্থক। "Chhotagalpa is a collection of small but very touching stories. . . . It is also written in support of the same movement (Reform). Some of these stories will be enjoyed by the orthodox and the non-orthodox community alike."

'সোনার তরী'কেও হরপ্রসাদ সমকালীন বাংলা কাব্যের উর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন নি। "The Sonar Tari by Babu Ravindra Nath Tagore, the Pradipa by Babu Akshay Kumar Baral, the Pratidhwani by Shrimati Mrinalini are miscellanies of more than average merit."

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত হরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্ট লিখেছেন রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথের 'কথাচতুষ্টয়' ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-কাহিনী 'দারোগার দপ্তর'কে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে ঐ বছরের রিপোর্টে। অর্থাৎ, এই দুটি বই-ই বাস্তব জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। মনোহারিত্বের কারণ রয়েছে গল্প বলবার ভঙ্গীর মধ্যে। "Ravindra Nath has formed his style on an English model, and there is a freedom and a raciness about it which are quite charming. No other Bengali author can boast of a style so happy, so flowing and so characteristic as his."

পর বৎসরের রিপোর্টে 'চিত্রা' সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "…remarkable for freshness of imagery and richness of fancy. Descriptive pieces generally, and those describing village life in Bengal specially, are exquisitely beautiful."

'কাব্যগ্রন্থাবলী' প্রকাশের পরে সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর মন্তব্য করবার সুযোগ পাওয়া গেল। রিপোর্ট-লেখক বলছেন, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সমকালীন বাঙালী কবিদের অগ্রণী। তাঁর অনেক কবিতায় "dreamy vagueness" থাকলেও তিনি স্বদেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন "a rich harvest of enjoyable and melodious verse."

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে শুধু 'পঞ্চভূতের' আলোচনা আছে। এ বই লেখা হয়েছে "in the author's well-known playful style, and is full of observations which bespeak a thoughtful mind, cultured taste, and a varied experience of men and things."

এর পরের রিপোর্টে রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ের আলোচনা নেই। উপরে আমরা যে কয় বছরের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের সব বইয়ের আলোচনা করা হয় নি। সমকালীন সমালোচনা হিসাবে রিপোর্টের মন্তব্যগুলির কিছু মূল্য আছে। এই-সব মন্তব্য সরকারী রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত বলে এদের কমবেশি গুরুত্বও আছে। চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন তা থেকে তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সভা জাতীয় স্বার্থ ও সংহতি -রক্ষায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রতিষ্ঠা অবধি ভারতবর্ষীয় সভা দুইটি মৌলিক বিষয়ের দিকে অবহিত হন। শাসনে ভারতবাসীর অধিকার লাভ করিতে হইলে আইন বা ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধিমূলক করিতে হইবে। ইহার প্রাথমিক ধাপ স্বরূপ প্রথমে মনোনয়ন এবং পরে নির্বাচন -দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়টি হইল শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণ। ইহা তখনই সম্ভব যখন সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় ভারত সন্তানেরা ইংরেজদের মত যোগ দিতে সমর্থ হইবেন। ইহারও প্রথম ধাপ স্বরূপ সভা প্রস্তাব করিলেন যে, লণ্ডনে যেরূপ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয় ভারতবর্ষেও তেমনি তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহা গ্রহণ করা হোক। সভার দুইটি প্রস্তাবই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কার্যে পরিণত করিতে ঐ সময় অস্বীকৃত হন। ইহার ফল কিরূপ বিষময় হয় একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব। সভা কিন্তু এ দুইটি বিষয়ে আন্দোলন পরিচালনা করিতে কখন বিরত হন নাই।

পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যেমন দায়িত্বশীল সরকার-বিরোধী দল থাকেন ভারতবর্ষীয় সভা নূতন সনন্দ অনুযায়ী আইন বা ব্যবস্থা পরিষদ স্থাপিত হইলে বাহির হইতে বে-সরকারী ভাবে অনুরূপ দায়িত্বশীল বিরোধী দলের মত কার্য করিতে থাকেন। আইন পরিষদে যে সব বিল বা আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইত সে সম্বন্ধে তাঁহারা নিজ মতামত ব্যক্ত করিতেন। প্রস্তাবিত আইনগুলির কল্যাণমূলক অংশ যেমন তাঁহারা সমর্থন করিতেন তেমনি জাতীয় স্বার্থ ও সংহতির হানিকর বিষয়গুলির তীব্র সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না। মধ্যে মধ্যে জাতির হিতকর কোন কোন প্রস্তাব করিয়াও তাঁহারা আইন পরিষদে পাঠাইতেন। আইন পরিষদ সে সমুদয় একেবারে অগ্রাহ্য করিতেন না। কোন কোনটি গ্রহণ করিয়া সভার মতামতের উপর গুরুত্বই আরোপ করিতেন। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলীর মধ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌরসভা, সংস্কৃত শিক্ষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিল্প-ব্যবসায় ও যৌথ কারবার সংক্রান্ত আইন, সমাজকল্যাণমূলক অথচ আর্থিক লাভ ক্ষতি মুক্ত উদ্যোগ, বিচার আদালত সংস্কার, দেওয়ানী ও ফৌজদারী-বিধি প্রণয়ন, সুপ্রিম কোর্ট ও নিজামত আদালতগুলি মিলাইয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভা গঠনমূলক অভিমত প্রকাশ করেন।

আইন পরিষদ ১৮৫৭ সনের প্রথমেই এমন একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন যাহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় সভার সম্পূর্ণ সায় ছিল। বহুকাল পোষিত গুরুতর বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অপসারণকল্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং আইনসভার সদস্য সার বার্ণেস্ পীকক ব্যবস্থাপক সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেন। ইহার মর্ম এই ছিল যে, মফস্বলের ফৌজদারি বিচারালয়ে ভারতবাসীদের ন্যায় ইংরেজদেরও সমভাবে বিচার হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলা দরকার। পূর্বে স্থানীয় ইংরেজদের দেওয়ানী ও ফৌজদারি সবরকম বিষয়েরই বিচার হইত একমাত্র কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টকে তখন 'কিংস্ কোর্ট' বলা হইত। মফস্বলের বিচার আদালতগুলিকে বলা হইত 'কোম্পানিস্ কোর্ট'। শেষোক্ত আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কোন রকম বিচার করিবার অধিকার ছিল না। টমাস্ বেবিংটন

মেকলে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রচার করেন। ইহাতে তখন ইউরোপীয় মহলে খুবই আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাহারা ঐ সময়েই ইহাকে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' নামে অভিহিত করে। মেকলে আইনটি সম্পূর্ণ বর্জন না করিয়া মফস্বলের দেওয়ানী আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা দিয়া যায়। ১৮৪৯-৫০ সালে তৎকালীন আইন সচিব বেথুন সাহেব কোম্পানির মফস্বলস্থ ফৌজদারি আদালতগুলিকে ইউরোপীয়দের বিচারের ক্ষমতা অর্পণের নিমিত্ত কতকগুলি আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। তখন পুনরায় আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়েরা এই সময় খুবই প্রভাবশালী হইয়া ওঠে। তাহাদের আন্দোলন এরূপ প্রবল আকার ধারণ করে যে বেথুন এগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এই সময়ও ইউরোপীয়েরা এই আইনগুলিকে 'ব্ল্যাক অ্যাক্টস্' নামে আখ্যাত করে। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। তাহারা মফস্বলে নীল ও অন্যান্য শিল্পের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি ক্রয় করে। তাহাদের বিচারের ক্ষমতা ফৌজদারি আদালতগুলির না থাকায় ইউরোপীয়দের অত্যাচার উৎপীড়ন চরমে উঠিল। খুনখারাপী করিয়াও দেশের মধ্যে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে তাহাদের পক্ষে কোনোরূপ বাধা হইল না। প্রজাসকল তখন ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতে থাকে। এই সকল অনাচারের কাহিনী ভারতীয় নেতারা কেহ কেহ, যেমন রামগোপাল ঘোষ, পূর্বেই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত সমাজের গোচরে আনিয়াছিলেন। দেশীয়—বাঙলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে ইউরোপীয়দের উপদ্রবের কাহিনী প্রায়ই বাহির হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। ভারতবর্ষীয় আইনসভায় ইহার মূলীভূত কারণগুলি দূর করিবার জন্যই বিচারপতি পীকক ঐরূপ একটি খসড়া আইন পেশ করিয়াছিলেন। উহার মূল কথা ছিল মফস্বলের দেওয়ানি আদালতগুলির মত ফৌজদারি বিচারালয়গুলিকেও ইংরেজদের (British-born European subjects) অপরাধের বিচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান।

খসড়াটি আইন পরিষদে উপস্থাপিত হইবার পর ইউরোপীয় মহলে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এবারে তাহারা যেরূপ জোট বাঁধে এমনটি পূর্বে কখন দেখা যায় নাই। ইংরেজ নীলকরদের সভা কলিকাতায় অবস্থিত। অপরাপর ইউরোপীয় শিল্প-ব্যবসায় সংক্রান্ত সংঘও এখানে বিদ্যমান। ইউরোপীয়দের মুখপত্র ইংরেজ সম্পাদিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলি প্রবল প্রতাপান্বিত। এরূপ অবস্থায় খসড়া আইনটির বিরুদ্ধে তাহাদের আন্দোলন যে নিরতিশয় তীব্র হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। 'নেটিভ'—কালা আদমীদের বিরুদ্ধে যেন সাজ সাজ রব। ১৮৫৭, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতাস্থ টাউন-হলে ইউরোপীয়দের বিরাট সভা হইল প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে। বক্তারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিল। মফস্বলের বিচার আদালতগুলি যে নানা দোষে দুষ্ট এবং ত্রুটিপূর্ণ তাহা বলিতে গিয়া বাঙালিদের চরিত্রের উপরও অযথা তীব্র কটাক্ষ করা হইল। প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাসীরাই ইউরোপীয়দের অধিকতর লক্ষীভূত, সুতরাং তাহাদের উপরই ইহারা অযথা গালিগালাজ বর্ষণ করে। ইহার একটি কারণও ঐ সময় অনুমিত হইয়াছিল। বাঙালিরা নব্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় এবং শাসন ও বিচারে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সমান অধিকার দাবী করিতে থাকেন, ইহা ইউরোপীয়দের একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। উপরন্তু শাসকজাতির অঙ্গীভূত বলিয়া ইংরেজগণ নিজেদের বহুকাল পোষিত অন্যায় অধিকারগুলির বিন্দুমাত্র অপহ্নব

ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিত। তাহাদের জাতিগত ঔদ্ধত্য সম্পর্কে নব্যশিক্ষিত বাঙালিরা সংবাদপত্রে বিশেষ সমালোচনা করিতে থাকায় ইংরেজদের আক্রোশ আরও বাড়িয়া যায়। এবারে যখন শাসক ইংরেজ এবং শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে বিচার সাম্যের কথা উঠিল তখন তাহারা কিরূপে নিরস্ত থাকিবে? আইনটি উপলক্ষ মাত্র, শিক্ষিত বাঙালিরাই হইল তাহাদের লক্ষ্য।

ভারতবর্ষীয় সভা নব্যশিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় সভা, নবজাগ্রত জাতীয়তার প্রতীক। সভার কর্তৃপক্ষ, পূর্বেই বলিয়াছি, কল্যাণমূলক সরকারী প্রস্তাবসমূহকে আন্তরিকভাবে বরাবর সমর্থন করিতেন। এবারেও বহুদিন প্রচলিত অন্যায়ের প্রতিকার এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে আইনপরিষদে যে খসড়াটি উপস্থাপিত হয় তাহাতে তাঁহারা উৎফুল্ল না হইয়া পারেন নাই। ইউরোপীয়দের অন্যায় প্রতিবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে তাঁহারাও টাউন হলে ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭ তারিখে একটি জনসভার আয়োজন করিলেন। মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলি ইংরেজ অপরাধীদের বিচারে অসমর্থ থাকায় তাহাদের অপরাধপ্রবণতা কিরূপ বাড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশাও কত চরমে ওঠে তাহা শিক্ষিত বাঙালিদের অজানা ছিল না। উক্ত সভায় উত্থাপিত বিবিধ প্রস্তাবের মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হয় এবং বিভিন্ন বক্তা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা প্রমাণ করিয়া দেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি। আয়োজিত জনসভায় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া তিনি যে পত্রখানি দেন তাহাতে মফস্বলের ফৌজদারি আদালতগুলির বিচারে অক্ষমতা হেতু ইউরোপীয়দের অনাচার কতখানি বাড়িয়া যায় তাহা বিবৃত করেন এবং এই আইনটিকে ইউরোপীয়দের কথিত 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা 'কালো আইনের' পরিবর্তে 'হোয়াইট এ্যাক্ট' বা 'শুভ্র আইন' বলিয়া অভিনন্দন জানান। এই পত্রখানি নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল—

My dear brother,

In reply to your kind letter of yesterday, requesting me to take the chair at the meeting to be held this afternoon, I regret to inform you that my ill-health will not permit me to accept the honor. I embrace this opportunity however, to make the following remarks on the momentous question to be discussed on the occasion. Should you deem it worthwhile to read them before the meeting, you are at liberty to do so.

The object of our meeting is to consider the propriety of supporting that portion of the draft of a law now before the Legislative Council of India, which refers to the extension of the Criminal Jurisdiction of the mofussil Courts to all classes of Her Majesty's subjects without respect of religion, race or place of birth.

The Penal Code of India with reference to the jurisdiction of the Company's Criminal Courts, as it now exists, is of a most objectionable character. It would not, I believe, be irrelevant to state here its principal features.

1st. Natives and all Europeans not British subjects are amenable to the authority of the Magistrates and Sessions Courts within whose jurisdiction they are apprehended and broght to trial. But European British subjects, for all acts of a criminal nature, are amenable only to Her Majesty's Courts and exempted from the jurisdiction of the Local Authorities in the administration of the Penal enactments of the Government of India 53 Geo. III Cap. Sec. 2 Cl. 1—ceded Prov. Reg. VI 1803, Sec. 19, Cl. 1 and Court No. 1296.

2nd. In the event of any charges being preferred against European British subjects which may render them liable to a criminal prosecution in Her Majesty's Courts, the process is so circuitous dilatory expensive, and productive of such infinite inconvenience and trouble to the prosecutors and witnesses, specially if they belong to the class of poor riots and cultivators that they (the European British subjects) are virtually allowed to commit crimes of the most heinous nature with impunity.

3rd. There are some petty offences for which indeed a European British subject can be tried by a mofussil Magistrate, but convictions in such cases are removable by Writ of certiorari into the Supreme Court 53 Geo. III. Cap. 155, Sec. 205.

4th. So great is the privilege of a European British subject that if a native happily happen to be a brother fellon with him, the Magistrate will not be able to try him (the native) without a reference to the Nizamat C.O. No. 29. Vol. I.

5th. The Magisterial authorities have not even the power to interrogate a European British subject brought before them for any alleged offence upon matters charged against them, C.O. No. 99 of Vol. 3rd.

Such are some of the odious features of a law unworthy of the enlightened principles of the liberal Government of one of the most civilized nations in the world, which the proposed humane enactment intends to obliterate from the Penal Code.

It is indeed strange that the British Legislature should have delayed so long to pass a law founded upon the broadest principles of justice and humanity but stranger still that many of the British inhabitants of India should protest against the enactment and stigmatize it by christening it "The Black Act."

The law proposed would strike at the foundation of this inhuman principle.

Far from deserving the epithet of "the Black Act"—I would call it "the White Act," it should be compared to the sun in his meridian splendour, shedding the refulgent beams of justice on all classes of people equally, and dim indeed are their eyes with prejudice who cannot behold its genuine nature. A celebrated Persian Poet has aptly said :—

"If his eyes cannot see in the day
 What fault is there in the rays on the sun."

"Desirst thou the Truth? It is better that a thousand eyes were thus blind, than the sun dark.'

There needs no argument to prove the necessity of a law dictating that justice should be administered without distinction of creed, colour or caste. Our most cordial and grateful thanks are due to the Hon'ble Mr. Peacock, for his having wisely and with a feeling of noble disinterestedness framed an act which proposes to render the administration of justice uniform to the British subjects of India at large. But as there are always two sides of a question, we should examine the sum total of the objections raised against the passing of the Act by oppositionists, it is no other than the standing imperfections of the Mofussil Courts.

I admit there are many serious defects in the constitution of these Courts, and I have all along both privately and publicly expressed this my opinion, but these should not in any wise interfere with the question at issue, which is simply this. Whether there should be one Penal Code for the Whites, another for the Blacks? One for the Christians and another for the Heathens? What unbiassed individual would not answer in the negative? What man of common sense would not see the injustice of a Saheb maltreating a poor native in the mofussil, under the most aggravating circumstances, and going unpunished owing to the difficulties of a prosecution in the Supreme Court? Who would not—if a stranger . . . . ১ of justice that, whilst a native is amenable to the local court both in Civil and Criminal cases a European British Subject . . . . ১ tried there only, in matters of civil controversy and would be penalty liable to the jurisdiction of Her Majesty's Courts?

The defects of the mofussil courts should certainly be enquired into, and corrected . . . ১ the Legislature but because not . . . ১ reformed, it is no reason that justice should . . . ১ to assume a mild form for the conquering and a harsh one for the conquered race.

It is indeed a mistaken notion of those, who suppose the amalgamation of the

Supreme and Sudder Courts would degrade the former and aggrandize the latter. The consolidated tribunal would inevitably be endowed with double the Power that each separately possesses: Local knowledge of the interior, a practical acquaintance with the manners and customs of the people and a due comprehension of zemindary affair and records would be combined with profound legal love and judicial acumen mutual error would be corrected and uniform justice would be dealt out. Union is power holds good in this as in other cases, it will be exemplified in this as it has lately been done on the shores of the Euxine.

Under these circumstances we would pray for the immediate promulgation of this salutary luminous and "White Act", and only suggest that the new Tribunal should be made none independent of the Government that it is intended to be made.

I beg our fellow British subject will not regard our proceedings with a hostile feeling ; it is not our wish that they should in any respect suffer ; all that we look for, is that justice should be dispensed with an even hand to all classes of Her Majesty's subjects. I shall not trouble you further, but conclude with wishing you every success in your laudable exertions, and subscribe myself.

Calcutta, Your obedient servant,
April 6, 1857. RADHAKANT [২]

পত্রখানিতে রাধাকান্তের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম সুপরিস্ফুট, অথচ ইহাতে জাতিবিদ্বেষ বা জাতিবৈরিতার লেশমাত্র নাই। ইংরেজেরা এ দেশেরই প্রজা, তাহাদের অপরাধের বিচার-ক্ষমতা মফস্বলের আদালতগুলির থাকিবে না— বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার ত্রুটি লক্ষ না করিয়া পারেন না। রাধাকান্ত দফাওয়ারী ভাবে মফস্বল আদালতগুলির পক্ষে ইংরেজদের কার্যকর বিচারক্ষমতা যে প্রকৃত প্রস্তাবে নাই তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। ইংরেজগণ প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে নানারকম আপত্তি তুলিয়াছেন, রাধাকান্ত ইহার অযৌক্তিকতা খণ্ডন করিতে সভাকে এই পত্রে অনুরোধ জানান। মফস্বলের আদালত-গুলির সংশোধন ও সংস্কার যে আবশ্যক তাহা কেহই অস্বীকার করেন না ; তার জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ইংরেজ-ভারতবাসী সকল প্রজারই যে একই রূপ বিচার হওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধেও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কথা উঠিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি মিলিত হইলে প্রথমটির অপকর্ষ এবং অপরগুলির ক্ষমতাধিক্য ঘটিবে— ইহা কেমন করিয়া বলা যায়? উভয় প্রকার উচ্চ আদালত সম্মিলিত হইয়া শহর মফস্বল সকল শ্রেণীর প্রজার অবস্থা দৃষ্টে সুবিচার হওয়া সম্ভব হইবে। রাধাকান্তলিখিত মূল বিষয়টি যে যুক্তিসিদ্ধ তাহা বিখ্যাত পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের নিম্নোধৃত পত্রখানি হইতেও সপ্রমাণ হয়। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইউরোপীয় পাদ্রীগণ জনসাধারণের হিতকর কার্যে ও উন্নতিপ্রচেষ্টায় সবিশেষ তৎপর ছিলেন। ডাফের পত্রখানি এই—

My dear Sir,

You have asked my opinion of the proposal to render British born subjects amenable to the mofussil courts. I have no hesitation in replying that I have always approved of such a measure, wisely and properly executed,—as equitable in itself and accordant with the broadest views of enlightened general policy. If objections have not been unfairly raised against the present constitution of the mofussil courts, the modes of procedure, the Codes of Civil and Criminal Law administered, and the qualification of the Judges—then clearly the true, statesmanlike and philanthropic remedy should consist not in retaining the machinery of justices now so loudly complained of, but in improving and elevating that imperfect machinery into an effective instrument of impartial justice alike to natives and Europeans, who are now equally subjects of the British Crown. In order, however, to bring about and insure the fruits of a reform so glorious the intellectual and above all the moral education of the people ought to be pressed with tenfold earnestness not only by the Government, but by the landholders and wealthier classes of every grade.

Men are beginning to talk of patriotism but in the present state of India, the truest patriot is he who denies himself most and disinterestedly labors most for the intellectual and moral illumination of an ignorant, superstitious, and down trodden population.

I remain,
Very sincerely yours,
(Signed) ALEXANDER DUFF.

মফস্বলের ফৌজদারি বিচার আদালতে ইংরেজ এবং ভারতবাসীর একই আইন-বলে সমভাবে বিচার হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে ডাফের অনুকূল অভিমত এই পত্রখানিতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। এই-সকল বিচার আদালতের সংস্কার এবং উন্নতির আবশ্যকতার কথাও তিনি বলিতে ভুলেন নাই। পত্রে শেষোক্ত কথা কয়টি আজিও প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রণিধানযোগ্য। স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইবেন এই কথাগুলি ডাফ পত্রের শেষে বড়ো সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন। ঐ সময়ে ধর্ম বিষয়ে উগ্র মতাবলম্বী হইলেও ইউরোপীয় পাদ্রীগণ স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজকল্যাণকর অন্য বহুবিধ প্রচেষ্টার সঙ্গে শহরে ও মফস্বলে নিজেদের সংযুক্ত করিয়াছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের চর্চায়ও যে তাঁহারা কেহ কেহ অবহিত হন তাহা আজ সুবিদিত। প্রজাকুলের প্রতি পাদ্রীদের দরদ ও মমতা নীল আন্দোলনের সময় নানাভাবে প্রকাশ পায়।

জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভা যে বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই জনসভায় উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ এবং তাহার উপর প্রদত্ত সভ্যদের বক্তৃতায় বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম

হয়। এই সময়ে ভারতহিতৈষী জর্জ টমসন পুনরায় ভারতে আসেন। সভায় তিনিও একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। উত্থাপিত প্রস্তাব তিনটির মূল কথা এই যে—১. মফস্বলের ফৌজদারি আদালতকে ইংরেজ ও ভারতবাসীর বিচারের সমান অধিকার অর্পণ সম্পর্কে আইন সভার প্রস্তাব সমর্থন। ২. ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যোগ্যতার সহিত নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন। এ জন্য তাহারা সকলেরই আস্থাভাজন যদিও পদমর্যাদায় তাঁহারা ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সমান নন। তাঁহাদের নিয়োগে বিচার আদালতগুলির যথেষ্ট সংস্কার সাধন সম্ভব হইয়াছে। ৩. তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে এ সত্ত্বেও বিচার আদালতগুলির উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। ফৌজদারি বিচার-বিধিতে ব্যবহার সাম্য প্রবর্তন, ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিচারক নিয়োগ ও স্বতন্ত্র বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা— এই উদ্দেশ্যে দেশী বিদেশী সকলেরই একযোগে কার্য করা আবশ্যক।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে কিশোরীচাঁদ মিত্র, জর্জ টমশন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁহারা নিজ নিজ বক্তৃতায় তথ্য প্রমাণ -সহযোগে প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বিশদভাবে আলোচনা করেন। কিশোরীচাঁদ দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিচার আদালতগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হন। তিনি বিচারে বৈষম্য হেতু দেশীয়দের লাঞ্ছনার বহু দৃষ্টান্তের বিশদ বিবরণ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। নব্য শিক্ষিত ভারতবাসীরা বিচার বিভাগে প্রবেশ করিয়া ইহাকে বিশেষভাবে কলুষমুক্ত করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের সুবিচারের সপ্রশংস উল্লেখ ইতিপূর্বে বহু পদস্থ ইংরেজ করিয়া গিয়াছেন। জর্জ টমসন দ্বিতীয় প্রস্তাবের সমর্থনে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া দেশীয় সুযোগ্য বিচারকদের অভিনন্দিত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণিত বিবিধ বিষয়ের সমর্থনে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার মধ্যে একস্থানে তিনি এই মর্মে বলেন যে, এ দেশে যে-সব ইংরেজ আসে তাহার অধিকাংশই বিলাতি সমাজে নিম্নস্তরের, এমনকি অপাঙক্তেয়। তাহার এই উক্তির ফলে ইউরোপীয়েরা বিশেষ বিরক্ত হন এবং ইণ্ডিয়ান ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ পদ হইতে ভোটাধিক্যে তাঁহাকে অপসারিত করে। সাত বৎসর পূর্বে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দেও এইরূপ একটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল। মফস্বলে সাধারণ লোকের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার-উৎপীড়নের বহু দৃষ্টান্তসহ একখানি পুস্তিকা লেখেন রামগোপাল ঘোষ। ইহাতে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয়গণের এতই উষ্মা বাড়িয়া যায় যে, রামগোপালকে অনুরূপ ভোটাধিক্যের জোরে ১৮৫০ খ্রীঃ কৃষি সমাজ (Agricultural and Horticultural Society) হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। রামগোপাল তখন এই সমাজে সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই ক বৎসরে ইউরোপীয় ও উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে জাতি-বৈরিতা কিরূপ বাড়িয়া যায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাবিত আইনের আলাপ-আলোচনাকালে তাহা বিশেষ প্রতিপন্ন হইল। বহুকালপোষিত বিচার-বৈষম্য বিদূরণের যে আশা উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া গেল তাহাও কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী একটি বিষম ব্যাপারের ফলে লুপ্ত হইয়া যায়। ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে এতাদৃশ বিচার-বৈষম্য হেতু পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় আন্দোলন বিশেষভাবে জোরালো হইয়া উঠে। ভারতবর্ষীয় সভা নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে সুপথে পরিচালনার নিমিত্তই এইরূপ একটি সমাজহিতকর প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন।

এই মাত্র যে আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা বলিলাম তাহা হইল সিপাহী যুদ্ধ বা বিদ্রোহ। ১৮৫৭, ১০ই মে সৈন্য

বিভাগের সিপাহীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে উত্তর ভারতে দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে তড়িৎ গতিতে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি নানা দিক হইতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হইয়াছে। সিপাহী যুদ্ধের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ করিয়া স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন স্থলে সুধীবৃন্দ ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনায় রত হন। কাহার কাহার মতে ইহা ব্রিটিশ ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সমর। এ দেশ হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নকেই যদি স্বাধীনতা সমর আখ্যা দেওয়া যায় তাহা হইলে হয়তো এই উক্তির মধ্যে খানিকটা সত্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা দুইটিকে একই অর্থে বা পরস্পরের পরিপূরক রূপে প্রয়োগ করিলে কোনোমতেই এই যুদ্ধকে ঐ রূপ আখ্যা দেওয়া যাইবে না। উত্তর ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলের শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষ ব্রিটিশের প্রশাসনিক নীতির দ্বারা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত এবং উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠে; তাহারা নামেমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহকে পুরোভাগে রাখিয়া সরকারে কর্মরত সিপাহীদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষ যে এক রাষ্ট্র, এক জাতি (Nation) এই বোধ ইহাদের মধ্যে জাগ্রত ছিল বলিয়া একান্তই প্রমাণাভাব। পূর্ব শতকের দুঃখ দুর্দশা সাধারণ মানুষ তখনও ভুলিতে পারে নাই। আহমদ্ শা আব্‌দালী ও নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, দিল্লীর বাদশাহের অন্তঃসারশূন্যতা ও নিরতিশয় অকর্মণ্যতা, বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, বিশেষ করিয়া বাঙলার বর্গীর হাঙ্গামা এবং নবাবী অনাচার এ দেশবাসীর মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া ছিল। ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র ভারত একীভূত হইবার পথে, অরাজকতা বিদূরিত করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় শাসক জাতি তখন তৎপর। ধর্ম এবং সমাজ-বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্ম করিবার পক্ষে এ দেশবাসীরা ক্রমে যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিতে থাকেন। পশ্চিমের জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও তাহাদের সম্মুখে। ভারতবর্ষীয় সভা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীদেরই সভা। তাঁহারা বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে প্রথম হইতে তৎপর হইয়াছিলেন। জাতীয় সংহতির ভিত্তি জাতীয় ঐক্যবোধ। তাঁহারা দেখিলেন আরব্ধ সিপাহী যুদ্ধ এই নবজাগ্রত জাতীয়তার তরু-মূলে ভীষণ আঘাত হানিতেছে। তাই তাঁহারা তীব্র ভাষায় ইহার নিন্দাবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোক সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে তীব্র নিন্দাবাদ ও কটূক্তি উল্লেখ করিয়া সে কালের শিক্ষিত বাঙালিদের উপর বিশেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির নির্গলিতার্থ এই যে, বাঙালিরা তখনও 'স্বাধীনতা সমরে'র গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অথচ সংবাদপ্রভাকর্ সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই, আমার যতদূর মনে হয়, স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাঙালি কবি। তাঁহারই কথা স্বদেশের কুকুর পুজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি অন্য প্রসঙ্গে স্বাধীনতার জয়গান করিয়াছেন একটি বিখ্যাত কবিতায় যাহার আরম্ভ—স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে··· ইত্যাদি।

পূর্ব প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় সভার একটি উদ্ধৃতি হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতবাসীরা তখনই ব্রিটিশের স্বাধীনতার সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজেদের দাসত্বের সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে স্বাধীনতাস্পৃহাও বাড়িয়া যাইতেছে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র মাধ্যমে সভারই মুখপত্র স্বরূপ জাতীয়তার ভিত্তিতে এই স্বাধীনতাস্পৃহার কথা প্রতিনিয়ত ব্যক্ত করিতেছিলেন।

এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় সভা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কখন চাহেন নাই। শাসক জাতির সহায়ে

ভারতবাসীরা একতাবদ্ধ হইয়া দ্রুত নিজেদের উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে এই বিশ্বাসের বলেই তাঁহারা সর্বপ্রকার কার্য করিয়া যাইতেছিলেন। এ সময়ে এইরূপ একটি বিদ্রোহের দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহারা বিদ্রোহীদের গর্হিত কার্যের নিন্দাবাদে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে এই মর্মে বলা হয় যে, এই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। উত্তর ভারতের যে-সব অঞ্চলে ইহা দেখা দিয়াছে সেখানকার জনসাধারণের সহানুভূতি তাহারা পায় নাই বলিয়া সভার বিশ্বাস। কুচক্রীদের প্ররোচনায় সিপাহীরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান একান্ত আবশ্যক। ভারতবাসীরা ব্রিটিশের সদিচ্ছা এবং শাসননীতির প্রতি আস্থাশীল এ কথাও ঐ প্রস্তাবে বলা হয়। বাঙালিরা কেন যে, শ্রেণীসংগ্রামকে স্বাধীনতা তথা জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া তখন গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা এই সময়কার ভারতবর্ষীয় সভার কার্যকলাপ হইতে সবিশেষ বুঝা যায়। ২৩শে মে (১৮৫৭) তারিখের সাধারণ মাসিক অধিবেশনে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় সভা নিম্নরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন:

'The Committee of the British Indian Association have heard of the disastrous events which have lately occurred at Meerut and Delhi with deep concern and sorrow.

'The Committee view with disgust and horror the disgraceful and mutinous conduct of the native soldiers at those stations, and the excesses committed by them, and confidently trust to find that they have met with no sympathy, countenance or support from the bulk of the civil population of that part of the country, or from any reputable or influential classes among them.

'The Committee of the Association record without hesitation their conviction of the utter groundlessness of the reports that have led a hitherto faithful body of soldiers of the state to the commission of the gravest crimes of which military men or civil subjects can be guilty, and the Committee deem it incumbent on them on the present occasion to express their deep abhorrence of the practices and purposes of those who have spread those false and mischievous reports.

'The Committee earnestly hope for the restoration of peace and good order, which they doubt not will soon be re-established by the vigorous measures which the Government have adopted in this exigency.

'The Committee trust and believe that the loyalty of their fellow subjects in India to the Government under which they live, and their confidence in its power and good intentions unimpaired by the lamentable events which have occurred, or the detestable efforts which have been made to alienate the minds of the Sepoys and the people of the country from their duty and allegiance to the beneficient rule under which they are placed.—*The Englishman,* Tuesday, 9 June, 1857.

ভারতবর্ষীয় সভা বিদ্রোহ দমনে সরকারী নীতিকে সমর্থন করিলেন বটে কিন্তু বেসরকারী ইউরোপীয়েরা এই সুযোগে বাঙালিদের উপর প্রতিহিংসা লইতে অতিমাত্র সচেষ্ট হইয়া উঠিল। এই সভা নিখিল ভারতীয় সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য স্থাপিত হইলেও ইহার কর্ণধারগণ তো নব্য শিক্ষিত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালি। এই শ্রেণীর বাঙালিরা যে প্রজাকুলের উপর ইউরোপীয়দের অনাচার-উৎপীড়ন সম্পর্কে সচেতন তাহা পূর্বেই তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে। বিদ্রোহকালের জরুরী অবস্থায় বড়লাট ক্যানিং সাময়িকভাবে মুদ্রাযন্ত্র আইন এবং অস্ত্র আইন জারি করেন। বিদ্রোহের শুরুতেই ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী বাঙালিদের নিগৃহীত করিবার জন্য অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হইলে আশ্চর্যের বিষয় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রথমেই ইহার কবলে পড়ে। আর এই ভারতবন্ধুর ভারতীয় বিদ্বেষ প্রচারই তাহার কারণ। ইউরোপীয়েরা জিদ ধরিল কলিকাতার এবং উপকণ্ঠস্থিত এ দেশবাসীদের অস্ত্র আইন বলে নিরস্ত্র করিতে হইবে। এই হেতু তাহারা সরকারে আবেদনপত্র প্রেরণের নিমিত্ত ইউরোপীয় সাধারণের নিকট ইহা স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষীয় সভা ইউরোপীয়দের মতিগতি সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সভা-কর্তৃপক্ষ তাহাদের মতলব জানিয়া ২৫শে জুলাই (১৮৫৭) তারিখে সাধারণ অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন :

That this Society has been informed that a petition is in circulaion among the Christian community of this metropolis praying Government to disarm the native population, but as no acts of that population within the last hundred years could in any wise be construed as disloyal towards its British rulers, and on the contrary, the Government have always had reason to be satisfied with their truth and good faith as subjects, the invidious measure of disarming one class in preference to another, could not but be viewed by the native community as an underserved and ungenerous manifestation of distrust on the part of Government towards them, and the Committee be therefore requested to address Government on this head with the least possible delay.—*The Englishman,* Saturday, 8 August. 1857.

ইউরোপীয়দের মতলব অনুযায়ী কার্য আর হয় নাই। তাহাদের আর একটি প্রস্তাব ছিল সমগ্র ভারতে ও দেশীয়দের উপর সামরিক আইন জারি। উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন প্রবর্তিত হইল বটে কিন্তু অন্য কোথায়ও ইহা চালু হইল না। ক্যানিংয়ের কার্যে ইউরোপীয় সমাজ খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং তাহার উপর 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং'— এই ব্যঙ্গাত্মক উপাধি বর্ষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রতি সপ্তাহে বাহির হইবামাত্রই বড়লাট ক্যানিং ভারতবাসীদের মতামত বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত ইহা পাঠ করিতেন এবং অনেকের বিশ্বাস তাঁহার ঐ সময়কার শাসননীতি ইহার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। এ দেশে বড়লাট ক্যানিংয়ের উপর ইউরোপীয় সমাজ যেমন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে বিলাতেও তাঁহার বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা নানারূপ প্রচারকার্য চলিতে থাকে। বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি ভারতবর্ষের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড এলেনবরা একটি বক্তৃতায় বলেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের বিবিধ উদ্যোগে বড়লাট

ক্যানিং অর্থ সাহায্য দান করার দরুণই প্রজাদের অসন্তোষ দেখা দেয়, এবং উহাই এই বিদ্রোহের একটি প্রধান কারণ। ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর ক্যানিংয়ের উদার শাসন পদ্ধতি সমর্থন করিতেছিলেন। এইরূপ একটি অর্থহীন উক্তি সম্পর্কে তাঁহারা নীরব থাকিতে পারিলেন না। ২৫শে জুলাইয়ের (১৮৫৭) উক্ত সাধারণ সভায় লর্ড এলেনবরার ভ্রমাত্মক উক্তির প্রতিবাদে এবং বড়লাট ক্যানিংয়ের উদার শাসননীতির সমর্থনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রস্তাব[৩] উত্থাপন করেন। এই সময় তিনি একটি আবেগময় সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি লর্ড এলেনবরা যে ভারতহিতৈষী তাহা স্বীকার করিয়াও এই মর্মে বলেন যে, উক্ত কারণে বিদ্রোহ ঘটে নাই। ইহার মূল অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। একশ্রেণীর লোকে সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া সমগ্র ভারতীয় জাতিকেই দোষারোপ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা একটি বহু পুরাতন সভ্যতার উত্তরাধিকারী; তাঁহারা নির্বিচারে আপাতলাভের নিমিত্ত কোনো গর্হিত কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয়দের জাতীয়তাবোধ এই সুপ্রাচীন সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, বহুশতাব্দীর পরাধীনতা সত্ত্বেও তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি এখনও সক্রিয় রহিয়াছে। কোনো ভারতীয় বিষয়ের আলোচনাকালে ইহা মনে রাখিতে হইবে। দক্ষিণারঞ্জন বলেন—

When discussing an Indian subject, it should always be remembered that this country is not inhabited by savages and barbarians, but by those whose language and literature are the oldest in the world, and whose progenitors were engaged in the contemplation of the sublimest doctrines of religion and philosophy, at a time when their Anglo Saxon and Gallic contemporaries were deeply immersed in darkness and ignorance ; and if owing to 900 years of Mahomedan tyranny and misrule this great nation has sunk in sloth and lethargy, it has, thank God, not lost its reason, and is able to make a difference between the followers of a religion which inculcates the doctrine that should be propagated at the point of the sword, and that which offers compulsion to none, but simply invites enquiry.

দক্ষিণারঞ্জন এই উক্তির মধ্যে ইসলাম এবং খ্রীষ্টধর্মের তুলনা করিয়া দ্বিতীয়টিকে বর্তমানযুগের উন্নতির মূলীভূত কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ জগৎ একদা খ্রীষ্টরাজ্যে পরিণত হইবে পাদ্রীদের এই বিশ্বাস তাঁহারা আদৌ সমর্থন করেন না বটে, কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিকল্পে পাদ্রীরা যে যত্ন লইতেছেন তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লর্ড এলেনবরা-ঘোষিত ধর্ম বিষয়ে সরকারের নিরপেক্ষ নীতির এ দেশীয়রা পূর্ণ সমর্থন করেন বটে তবে এ কথা কোনো মতেই ঠিক নয় যে, বিশেষ বিশেষ মিশনরী প্রতিষ্ঠানকে বড়লাট কর্তৃক অর্থসাহায্য হেতুই এইরূপ একটি সাংঘাতিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। যুদ্ধবিদ্যা ব্যতিরেকে সিপাহীদের সাধারণ শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করিতে দক্ষিণারঞ্জন এই বক্তৃতায় সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। তিনি এই মর্মে বলেন যে, মাতৃভাষায় নির্দিষ্টমান পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর সিপাহীদের সৈন্য বিভাগে ভর্তি করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তাহাদের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সৈন্যদের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ইহার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। যাহারা জ্ঞানলাভে উৎকর্ষ দেখাইবে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে হইবে। যুদ্ধের

সময় ব্যাতিরেকে অন্য সময় বৃথা আলস্যে ও গালগল্পে না কাটাইয়া তাহাদের মধ্যে মানবিকতাবোধ উন্মেষ এইরূপে সম্ভব হইবে। অপরের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও উদ্বুদ্ধ হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার অন্যতর সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রস্তাবের সমর্থনে বলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূল খুঁজিতে হইবে আরও গভীরে। অপদস্থ ও রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিদের পক্ষে কতকগুলি লোক সিপাহীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাইবার সুযোগ পাওয়ায় বিদ্রোহ এইরূপ ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তবে ইহা একটি শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, ভূস্বামী—জনসাধারণ এই বিদ্রোহ হইতে দূরে রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের অপরাধের জন্য সমগ্র ভারতবাসীকে সায়েস্তা করিবার প্রবৃত্তি আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে।

বিদ্রোহের মধ্যেই ১৮৫৭, ১লা আগষ্ট বঙ্গের ছোট লাট নিজ দায়িত্বে জরুরী অবস্থায় মফস্বলের নীলকর ইউরোপীয়দের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিয়োগ করা শুরু করেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় সভা বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মফস্বলের নীলকরদের অনাচার অত্যাচার এবং অন্যায় জোট সুবিদিত। তাহাদের উপর শাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে প্রজাকুলের দুঃখদুর্দশার অবধি থাকিবে না। ভারতবর্ষীয় সভা উহার প্রতিবাদে যে স্মারকলিপি সরকারে পাঠাইলেন তাহাতে আইনগত একটি বিষয়ের উপরই তাহারা বিশেষ জোর দেন। লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকেই সরকারী বিচারক পদে নিয়োগ করা হইবে না—এবম্বিধ সরকারী নিয়ম এবং চিরাচরিত রীতি কর্তৃপক্ষ এই ভাবে ভঙ্গ করিয়াছেন, এই কথাই স্মারকলিপিতে বিশেষ করিয়া বলা হইল। ইহার ফলে দেশে অনাচার উৎপীড়ন যে বাড়িয়াই চলিবে ইহারও আভাস দিলেন এই স্মারকলিপিতে। সরকার কিন্তু জরুরী অবস্থার অজুহাতে সভার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হন। বৎসরখানেকের মধ্যেই অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণের অত্যাচার-নিপীড়নে প্রজাকুল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সভা নীলকর ম্যাজিষ্ট্রেট লারমুর এবং ডিরেটের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সরকারে লেখেন যে তাহারা নিজ নিজ এলাকায় পেয়াদা হইতে উপরিতন কর্মচারীগণকে নির্লজ্জভাবে নীল চাষীদের উৎপীড়নে নিযুক্ত করিয়াছে। বিদ্রোহান্তে স্থানীয় সরকার এই ব্যবস্থার কতকটা সংস্কার করিলেও নীলকর এবং নীলচাষীদের মধ্যে তিক্ততা অতিদ্রুত বাড়িয়া যায়। ফলে প্রজাদের মধ্যে একটি ব্যাপক নীলকর বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

বিদ্রোহকালে সিপাহীদের নৃশংসতা এবং তাহাদের দমনের জন্য সরকারী সেনাবাহিনীর শতগুণ বর্বরতায় দেশের মধ্যে অস্বস্তি এবং অশান্তির ঘনছায়া দেখা দিল। এ দেশে এবং বিলাতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহের অছিলায় আপামর ভারতীয় জনসাধারণকে সায়েস্তা করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন করিতে থাকে। বিলাতে বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি লর্ড এলেনবরা হাউস অব লর্ডস-এ এবং ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটির সভাপতি উদারনৈতিক জন ব্রাইট হাউস অব কমনস্-এ এতাদৃশ ভারতবিরোধী আন্দোলনের রাশ আগলাইয়া রাখিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হন। ভারতবাসীদের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির নিকট হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ১৮৫৮ সনের মাঝামাঝি একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়া উভয় পার্লামেণ্ট হইতে পাশ করাইয়া লন। হাউস অব লর্ডস্-এ লর্ড এলেনবরা এবং হাউস অব কমনস্-এ জন ব্রাইট এই আইনের ধারাগুলিকে ভারতবাসীর পক্ষে অনুকূল করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে যত্ন লন। ধর্ম বিষয়ে সরকারী নিরপেক্ষতা এবং প্রশাসনিক কার্যে ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে

সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার—এই আইনের দুইটি প্রধান বিষয়। কোম্পানির শাসন বিলুপ্ত হইয়া ব্রিটিশ রাজের হস্তে যাবতীয় ক্ষমতা অর্পিত হইল এই আইন দ্বারা। ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব হইতেই এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত হন। ইহার দুইজন প্রধান সমর্থক লর্ড এলেনবরা এবং জন ব্রাইটকে অভিনন্দিত করিয়া ১৮৫৮ সনের ২রা অক্টোবর তারিখের সাধারণ সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি এই :

That the session of Parliament having come to a close, the Members of the British Indian Association feel it their duty to record their deep sense of obligations under which people of India have been laid by Right Hon'ble the Earl of Ellenborough by his labours in the House of Peers, and by John Bright, Esq., by his labours in the House of Commons during the past session,—labours unsurpassed in their arduousness, performed in a spirit of earnest patriotism and philanthropy, and directed by the most statesmanlike wisdom and foresight.

ভারতবর্ষীয় সভা এই দুই বৎসরে ভীষণ দুর্যোগ ও সংকটের মধ্যেও বিবিধ গঠনমূলক প্রস্তাবের আলোচনা পর্যালোচনা করিতেও বিরত হন নাই। বিচার আদালতগুলির সংস্কারকল্পে তাঁহারা এই মর্মে একটি প্রস্তাব করেন যে, সিবিল সার্বিসের কর্মী বাদে স্বাধীন ব্যবহারজীবী ইংরেজ আইরিশ ব্যারিস্টার ও স্কচ এ্যাডভোকেটগণকে বিচারকপদে নিয়োগ করা আবশ্যক। তখনও দেশবাসী বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন নাই, নহিলে তাঁহাদের কথাও সভা অবশ্যই বলিতেন। সুপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত দুইটি একীভূত করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট—উচ্চতম ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা পার্লামেণ্টে আবেদন প্রেরণ করেন। বিলাতে ভারতবর্ষীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে যে আইন রচনা কার্য চলিতেছিল ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান রিফর্ম সোসাইটি ইহাকে ভারতীয় সমাজব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার ও উন্নতিকল্পেও ভারতবর্ষীয় আইন সভায় যৌথ কারবার সম্পর্কীয় একটি আইনের খসড়া এই সময় উপস্থাপিত করা হয়। ইহার উপরেও সভা একটি বিশেষ উপযোগী সংশোধন প্রস্তাব সম্বলিত লিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। লিপিতে তাঁহারা বলিলেন যে, ব্যাঙ্ক এবং জীবনবীমাগুলিকেও এই আইনের আওতার মধ্যে আনা উচিত। মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে অর্থ লইয়া ছোটো ছোটো কারবারীরা ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে না। দেশের মধ্যে মজুত মূলধন—অইনানুগ ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতেই লোকে গচ্ছিত রাখিতে উৎসুক হইবে। এইরূপে মূলধন সহজলভ্য হইলে ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি এবং প্রসার ত্বরান্বিত হইবে। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও ইহার ফলে ফিরিয়া যাইবে। এই সময়ে আর একটি প্রস্তাব হয় যাহা সমাজের হিতকল্পে বিশেষ প্রয়োজন। লাভবিহীন সমাজকল্যাণকর উদ্যোগগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত একটি আইনের প্রস্তাবও করা হয় ভারতবর্ষীয় সভার পক্ষে। সভার অন্যতম প্রধান সদস্য প্যারীচাঁদ মিত্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁহারই নির্দেশে সরকারকে এইরূপ একটি আইন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব পূর্বেই করিয়াছিলেন।

ভারত সরকার খ্রীষ্টীয় যাজক বিভাগ পোষণ করিয়া থাকেন। এ দেশবাসীরা বহুপূর্ব হইতেই ইহার

অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। এই সময়ে বিলাতে প্রতিপত্তিশালী ধর্মযাজকগণ এই বিভাগটিকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষীয় সভা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই।

শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় সভা বরাবর অবহিত। ইংরেজী শিক্ষা সংকোচনের নিমিত্ত বিলাতে এই সময় একটি আন্দোলন উপস্থিত হইল। আন্দোলনকারীদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হেতুই ভারতবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভা কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। বিলাতে লর্ড এলেনবরা, লর্ড স্ট্যান্‌লি প্রমুখ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আন্দোলনের সপক্ষতা না করিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের আয়োজন করিতে উদ্যোগী হন। এই সময় সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতা হেতু কলিকাতার সংস্কৃত কলেজটিকেও তুলিয়া দিবার কথা উঠিল উচ্চ সরকারী মহলে। সভা এই প্রস্তাবের আঁচ পাইয়া নানা যুক্তি সহকারে ইহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট লিপি পাঠান। সংস্কৃত কলেজ শুধু সংস্কৃত শিক্ষারই আয়োজন করে না, এখানে সংস্কৃত শিক্ষা পাইবার দরুন যুবক-পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার যথাযোগ্য অনুশীলন দ্বারা ইহার উন্নতি করিতেও সক্ষম হন। সংস্কৃত শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটিলে দেশ-ভাষা সমূহের উন্নতি সাধন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সরকার অতঃপর এ প্রচেষ্টা হইতে বিরত হন। কলিকাতা পৌরসভার কার্যাদি সম্পর্কেও সভা যে বরাবর সচেতন তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। কলিকাতাস্থ দেশীয় অধিবাসী অধ্যুসিত অঞ্চলের উন্নতি সম্পর্কে পৌরসভার ঔদাসীন্য সুবিদিত। এখানকার পথ, ঘাট, নর্দমা প্রভৃতির সংস্কার ও প্রসার -কল্পে শুধু ইউরোপীয়দের লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠনের প্রস্তাব হয়।

ভারতবর্ষীয় সভা এরূপ একটি ব্যাপারে ভারতবাসীদের লওয়া যে অত্যাবশ্যক তাহা প্রতিপাদন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরে এ প্রস্তাবানুসারে কার্যও হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় সভার সার্থক কার্যকলাপে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত সাধারণ ইহার দিকে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। বিভিন্ন স্থলে তাঁহারা সভার আনুকূল্যে শাখাসমিতি গঠন করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মূল সভা অথবা শাখাসমিতির সদস্য হইলেন। সভার কার্য সাধারণের মধ্যে প্রচারের নিমিত্ত সরকার হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি এবং সরকারের নিকট প্রেরিত আবেদনপত্রাদি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব স্মারকলিপি এবং আবেদনপত্রগুলি তাঁহারা খণ্ডে খণ্ডে পুস্তক আকারেও প্রকাশ করিতে থাকেন। সভার অন্যতম প্রধান সদস্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহার মুখপত্র স্বরূপ এই সময়ে যে কার্য করিয়া আসিতেছিল তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৫৮ সনের প্রথম হইতেই স্বনামধন্য কৃষ্ণদাস পাল ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি তখন মাত্র বিংশতিবর্ষীয় যুবক। তাঁহার কর্মকুশলতায় সভা পরবর্তী দশকে ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং একটি বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকরূপে তিনি পত্রিকাখানিকে ভারতবর্ষীয় সভার পুরাপুরি মুখপত্র করিয়া তোলেন। ইহা অবশ্য কিছু পরের কথা। যাহা হোক, ভারতবর্ষের সঙ্কটকালে, ১৮৫৭—১৮৫৮ এই দুই বৎসরে বিবিধ কার্যের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষীয় সভা আত্মসচেতন, সুসংহত একটি ভারতীয় মহাজাতির ভিত্তি রচনায় সবিশেষ তৎপর হইলেন।

১ কীটদষ্ট অংশ

২ 'The Hindu Intelligencer'—April 13, 1857.

৩ প্রস্তাবটি এই —

That though this Society perfectly coincides with the ex-Governor General, Lord Ellenborough, as to the propriety of Government exercising no interference with the religion of the country, yet in justice to the present Governor General, deems it necessary to record that it has not failed to pay due attention to the acts of Lord Canning's administration, but there has been none of that nature which could be properly reckoned as an interference with our religion, or could give rise to rebellion; and the society cannot but record its humble approbation of the present Governor General's measures for the preservation of the peace of this realm under the peculiar circumstances in which it has been placed by the recent unforeseen and unfortunate mutinies.—*The English man*, 8, August 1857.

দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার। শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৬। মূল্য সাড়ে তের টাকা।

দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন। শ্রীদিলীপকুমার রায় -সংকলিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., কলিকাতা ৭। মূল্য আট টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবিতকালে খ্যাতি পেয়েছিলেন। তাঁর আর্যগাথা আষাঢ়ে মন্দ্র কাব্যত্রয়ী রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। নাট্যমঞ্চে তাঁর নাটকগুলির আদর অব্যাহত ছিল। 'হাসির গানে' তিনি অভিনবত্ব এনেছিলেন। স্বদেশপ্রেমে তাঁর অক্লান্ত নিষ্ঠা স্মরণযোগ্য। এসব সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল অধুনা প্রায় বিস্মৃত। কিছু পরিমাণে উপেক্ষিত। এমন হবার কারণ যে কি তা ভেবে দেখবার যোগ্য। কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্রাসের কারণ তাঁর রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাবের মধ্যে খোঁজেন। এইটি অমূলক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রবিরোধিতা দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যজীবনে একটি অপরিহার্য অধ্যায় হলেও কবি-নাট্যকার সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকের উৎসাহের অভাবের কারণ আরও কিছু আছে বলে মনে হয়। তিনি যে নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি আজ আর বিশেষ মঞ্চস্থ হয় না। শৌখিন নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক মাঝে মাঝে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ডাক পড়ে। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল যে ধরণের নাটক রচনা করেছিলেন, আজকের দর্শক সেরকম নাটক চায় না। নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতি এখন পরিবর্তিত। রোমান্টিক এবং ঐতিহাসিক নাটক বাংলাদেশে আর জনপ্রিয় নয়। একালের মানুষ রোমান্টিক ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছে এমন বলি না, কিন্তু একালের রোমান্টিক মানসের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদের কোথায় যেন একটা ব্যবধান রচিত হয়েছে। উঁচু সুরে বাঁধা জীবনের প্রতি মানুষের আর তেমন শ্রদ্ধা নেই। রাজপুত অথবা মোগল সম্রাটরা বর্তমানে আমাদের আর তেমন করে উৎসাহিত করে না। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাহ্রাসের এও একটা কারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল যে-সমস্ত হাসির গান রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যেও সমসাময়িকতার ছাপ আছে। সমসাময়িক কালের উজান বেয়ে সেগুলি একালের তীরে বাসা বাঁধতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'হসন্তিকা'য় যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন সেগুলিও আজ চলতি নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই। তথাপি গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্ব দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাকে আড়াল করে ফেলেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি বাঙালি পাঠকের কিঞ্চিৎ উপেক্ষার কারণস্বরূপ যে ইঙ্গিতগুলি করা হল সেগুলি সবই ঠিক কি না, এবং এই উপেক্ষা প্রদর্শন সংগত কি না তার আলোচনা করেছেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায় 'দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার' গ্রন্থে। বস্তুত, রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থটি গবেষণাপুস্তক হিসাবেই কেবল নয় সময়োপযোগী বলেও অভিনন্দিত হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে যে সংশয় ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে সে-সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের নিরসন করেছেন।

বেশ কিছুদিন আগে দেবকুমার রায়চৌধুরী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী রচনা করেছিলেন। তার পর নবকৃষ্ণ ঘোষ দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন। দ্বিজেন্দ্রলাল-পুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই গ্রন্থগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য প্রায় সবই আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও কবিজীবনী ও কিছু সাহিত্য-আলোচনা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এর পরেও রথীন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির প্রয়োজন ছিল। রথীনবাবু পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন কিন্তু নিজেও সেই পথের সীমাকে বিস্তৃত করেছেন। উপপথ শাখাপথ চিনিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাপক। তাঁর কথায় 'বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যকীর্তির মূল্য নির্ণয় করতে গেলে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বরূপধর্ম ও অন্তঃপ্রকৃতির বিচার করা ছাড়া তা সম্ভবপর নয়। তাই দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একটি কাল, বাংলাসাহিত্যের একটি যুগ ও বাঙালির রসরুচির একটি অধ্যায়কেই আলোচনা করতে হয়েছে।' এই দেশকালের প্রেক্ষাপটটি রথীনবাবু সুন্দর করে বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন অধ্যায়ে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রসঙ্গ এই কয়টি: কবিজীবনী, দেশ-কাল, দ্বিজেন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, কাব্যকীর্তি ও কলাবিধি, প্রহসন ও হাস্যরস, নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার, দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নানা প্রসঙ্গ, দ্বিজেন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনা, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব, দ্বিজেন্দ্রমানস: বৈচিত্র্য ও ঐক্য।

এই বইতে কবিজীবনী অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এইটি অত্যন্ত সংগত হয়েছে। আজকাল একজাতীয় গবেষণাগ্রন্থে তথ্যনিষ্ঠার বাহুল্য যেমন লক্ষ করা যায় তেমনি দেখা যায় পূর্বে আলোচিত বিষয়ের পুনরায় উত্থাপন। রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে পাদটীকায় আকরগ্রন্থের উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যকে যথাযথ সংক্ষিপ্ত করেছেন। পূর্ববর্তী জীবনীকারেরা জীবনীই রচনা করেছেন, রথীনবাবু সে ক্ষেত্রে জীবনী-গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করে দ্বিজেন্দ্রমানসের সারস্বত দিকটিকে প্রকাশ করেছেন। রথীনবাবু প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের 'কবিজীবনী' প্রবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এই দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ দেশ-কালের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটটি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক কালে এক দিকে স্বদেশচর্চার তীব্র উত্তেজনা ও প্রচণ্ড উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, অপর দিকে কিছুসংখ্যক চিন্তানায়কদের চিত্তে ধর্মের গোঁড়ামি বাসা বেঁধেছিল। এক দিকে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে অঙ্গীকার অপর দিকে প্রাচ্যবিদ্যার সনাতন কল্যাণবোধকে স্বীকৃতি এই দুইই শিক্ষিত বাঙালি মেনে নিয়েছিল। এই আলোড়ন-বিলোড়ন দ্বিজেন্দ্রলাল লক্ষ করেছিলেন। এমনকি তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ধর্মের শাসনের নিষ্ঠুর রূপটি দেখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মে সমাজমানসের এই আলোড়ন-বিলোড়ন প্রভাব ফেলেছিল। দ্বিজেন্দ্রসংগীত এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির পটভূমিকা রচনা করেছে এই দেশ-কাল।

তৃতীয় প্রসঙ্গে রথীনবাবু আর্যগাথা, হাসির গান, আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী এই কাব্যগ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতার এমন সুচারু বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে হয় নি। গীতিকবিতার আদর্শ, হাসির গানের শ্রেণীবিভাগ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, বাংলা কবিতায় দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরসের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব লেখকের আলোচ্য বিষয়। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার সমধর্মী না হলেও এইগুলির স্বাতন্ত্র্য কোথায় লেখক বিশ্লেষণের সাহায্যে

তা দেখিয়ে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের ঐতিহাসিক বিবেকের সচেতনতা লক্ষ করবার মত। কেবল একটা জায়গায় পাঠকের একটু খেদ থেকে যায়। হাসির গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপ কবিতাগুলির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার তুলনামূলক আলোচনা থাকলে প্রসঙ্গটি আরও গভীর হতে পারত। কাব্যরীতি ও কলাবিধি অধ্যায়ে লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনির্মাণ পদ্ধতির অভিনবত্বের দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রকাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ওজোগুণ, অনুষ্টুপ ও পজ্ঝটিকা ছন্দের নিপুণ প্রয়োগ, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লঘু ও হাল্‌কাচালের কবিতানির্মাণ, স্তবকসজ্জায় অভিনবত্ব ইত্যাদি রথীনবাবু আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনায় তাঁর ছন্দসৃষ্টির প্রসঙ্গ প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। নূতন ছন্দের নির্মাতা হিসাবে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হওয়া উচিত। মধুসূদন আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা অক্ষরবৃত্তের অপরিমেয় সম্ভাবনা, রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন এবং পূর্ণতা দিয়েছিলেন মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়ে গেলেন স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি। তাঁর এই আশ্চর্য নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু প্রথাগত সমালোচকদের মত বিশ্লেষণ করে যান নি। দীর্ঘকাল দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দনৈপুণ্য অবহেলিতই ছিল। অনেকেই একে ব্যর্থতা বলেই মনে করেছেন। প্রথমে ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (উদয়ন ১৩৪০ আশ্বিন) ও পরে শ্রীদিলীপকুমার রায় (ছান্দসিকী, ১৩৪৭) এবং মোহিতলাল (বাংলা কবিতার ছন্দ, ১৩৫২) দ্বিজেন্দ্রলালের এই ছন্দের অভিনবত্ব দেখিয়ে দেন। মনে হল, আলোচ্য গ্রন্থকার এঁদের আলোচনাতেই পুরোপুরি নির্ভর করেছেন। প্রসঙ্গত রথীনবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লাসিক্যাল বাক্‌রীতির বৈশিষ্ট্যটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রহসন ও হাস্যরস পর্বে রথীনবাবু পূর্ববর্তী কবিসাহিত্যিকদের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের মৌলিকতা কোথায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

পরের নিবন্ধটিতে লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকর্মের বিস্তৃত রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে, লেখকের আলোচনাপদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক এবং সূক্ষ্মদর্শী। তিনি নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে নাটকগুলির বিচার করেছেন, ঐতিহাসিক নাটকগুলির বিচারে ইতিহাসবিচ্যুতি এবং ইতিহাসনিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রথীনবাবু নাটকবিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের ধারাবাহিক বিবর্তনটিকেও ইঙ্গিতে আভাসে ধরবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী নিবন্ধটি পূর্ব নিবন্ধটিরই দ্বিতীয় অংশ। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দীনবন্ধুর এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যধর্মের পার্থক্য কোথায়, মিলই বা কতটুকু তা লেখক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। নাটক আলোচনার উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'অন্তর্দ্বন্দ্ববহুল চরিত্রসৃষ্টি, উজ্জ্বল-বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, নাটকীয় সংস্থান ও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি, নাটকীয় টেকনিকের অভিনব প্রয়োগ, শেক্সপীয়রীয় নাট্যকলার অনুসরণ, নাটকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে এক উন্নত রসের ধারা প্রবাহিত করেছিল— 'নাট্যশালাগুলি 'বেল্লিকবাজার' থেকে 'আনন্দবাজারে' পরিণত হয়েছিল।'

দ্বিজেন্দ্রসংগীতের বিশিষ্টতা সকলেই লক্ষ করেছেন। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রসংগীতের বিস্তৃত আলোচনা সকলকে মুগ্ধ করবে। লেখক উনবিংশ শতাব্দীর সংগীতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রসঙ্গত

পাশ্চাত্য সংগীতধারা বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে কি রকম প্রভাবশীল ছিল তার কথা বলেছেন। দ্বিজেন্দ্র-সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতরীতি কি রকম সুফল ফলিয়েছিল সে কথাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সংগীতের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল থেকেই টান ছিল। এবং তিনি নিষ্ঠা নিয়ে সংগীতচর্চাও করেছেন। বাংলার সুরকারদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্টতাও স্মরণীয়। সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে কি রকম সিদ্ধি পেয়েছিলেন রথীনবাবু সে কথা সবিস্তারে বলেছেন। এমনকি স্বদেশসংগীতেও দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্টতা সমালোচকদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় নি। দ্বিজেন্দ্রনাটকে সংগীতের নিজস্ব মূল্য এবং নাটকীয় মূল্য নির্ধারণে রথীনবাবু আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, আমরা নাটকে গান শুনতে অভ্যস্ত। অনেক সময়েই নাটকে এই সংগীতের বাহুল্যকে বাঙালির বিশিষ্ট মানসিকতার উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। রথীনবাবু তাঁর গ্রন্থে সে রকম প্রচলিত মতকে আমল না দিয়ে সংগীতগুলির নাটকীয় তাৎপর্যের উপরই জোর দিয়েছেন বেশি।

দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যরচনা বেশি নয়। বলা বাহুল্য, গদ্যরীতিতে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কৃতিত্ব নেই। তাঁর পত্রসাহিত্য, কালিদাস ও ভবভূতি সম্বন্ধে নিবন্ধ, 'চিন্তা ও কল্পনা'র প্রবন্ধাবলী রথীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের বস্তু।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্ম সমসাময়িককালে এবং পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কিরকম প্রভাব ফেলেছিল তা পাঠকের কৌতূহলের বিষয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ইত্যাদি কবিবৃন্দ কোনো-না-কোনো প্রকারে দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট ঋণী। কেউ শব্দচয়নে, কেউ ক্লাসিক্যাল রীতির অনুসরণে, কেউ স্তবকনির্মাণপদ্ধতিতে, আবার কেউ ছন্দোনির্মাণে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কবিতায় যেমন, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত। গ্রন্থকার এই প্রভাব-অনুসরণ-পর্বটি সংক্ষিপ্তভাবে উত্থাপন করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের বৈচিত্র্য ও ঐক্য নিবন্ধটিতে রথীনবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকর্মের সার্থকতা কোথায় তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। লিরিসিজ্‌ম্‌ ও স্যাটায়ারের সর্বোত্তম সমন্বয় ঘটেছে মন্দ্র কাব্যগ্রন্থে। নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি দেশপ্রেম পরহিতব্রত আদর্শবাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রণের মধ্যে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় ত্রুটিবিচ্যুতির দিকটিও লেখক আলোচনা করতে দ্বিধা করেন নি। শেষজীবনে যে দ্বিজেন্দ্রলাল 'জনচিত্তরঞ্জন সুলভ উত্তেজনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন' সে সম্বন্ধে লেখকের সন্দেহ নেই। ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় ভাবাতিরেক-প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতা সে যুগে একটি বৃহৎ ঘটনা। একালের পাঠকও দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধিতার স্বরূপটি সম্বন্ধে সচেতন। 'আনন্দবিদায়' নাটকের অভিনয়-ঘটনাটি সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বোধ করি তা আজও অনেকের মন থেকে যায় নি। এই গ্রন্থে রথীনবাবু সে প্রসঙ্গটির আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল। সাধারণ লেখকের রচনায় এই বিষয়টি এমনভাবে উত্থাপিত হতে পারত যার ফল হত মারাত্মক। কিন্তু গ্রন্থকার প্রসঙ্গটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অযথা দোষক্ষালন করবার চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি এ কথা বলেছেন, এ বিরোধ ব্যক্তিগত নয়— সাহিত্যগত। দুটি মতবাদের

বিরোধ। এ বিরোধ সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্গত। দ্বিজেন্দ্রলালের যখন কোনো খ্যাতি ছিল না তখন রবীন্দ্রনাথই তাঁকে সাহিত্যজগতে পরিচয় করে দেন। এতৎসত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন এমন আশা করা যায় না। রথীনবাবু বিরোধের সূত্রপাত থেকে বিরোধের শেষ পর্যায়টি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ বিরোধে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ উৎসাহ থাকলেও বিরোধের পরিণাম যে কেমন আকার লাভ করবে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। লেখক দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সপ্রশংস সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে, আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।' পরিশেষে রথীনবাবুর সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর কবিকীর্তির মোহ তাঁর [দ্বিজেন্দ্রলালের] ভাব-স্বাতন্ত্র্যকে আবিষ্ট করতে পারে নি— বস্তুসত্যের প্রতি বিশ্বাস বুদ্ধি বিচারের অতন্দ্র শাসন তাঁকে কাব্যমূল্যের আর-একটি প্রত্যয়ে অচল-প্রতিষ্ঠ করেছিল। কোনো সময় বিভ্রান্তি ঘটলেও তিনি মনের অনন্যতা হারান নি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই অপঠিত ও অনাদৃত।'

আলোচ্য গ্রন্থের যে সংক্ষিপ্তসার সংকলন করা হল তা থেকে সহজেই বোঝা যাবে লেখকের আলোচনার পরিধি ব্যাপক। দ্বিজেন্দ্রলাল বিস্মৃতপ্রায় লেখক। বাঙালি পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে বিস্মৃত হয়ে লাভবান হয় নি। এই গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল-সমীক্ষা একালের পাঠকের সামনে নূতন ইঙ্গিত দেবে। পূর্বসূরীদের আলোচনায় বর্তমান কালের সাহিত্যধারার বিচার সহজ ও সরল হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থটি সে কাজে সহায়তা করবে।

রথীনবাবুর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অযথা স্তুতি করেন নি। দ্বিজেন্দ্রমানসের উৎস নিরূপণ করে তিনি তাঁকে যথাযথ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এককালে আমরা আমাদের নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহী ছিলাম। সে সময় নাটকগুলির গঠনপারিপাট্য সম্বন্ধে দর্শক অবহিত থাকত না। রথীনবাবু একালে সেযুগের নাট্য-আন্দোলনের ঢেউগুলি লক্ষ করেছেন। সকল ঢেউই যে মনোহর, এ কথা তিনি বলেন নি। তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতির কথা তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। আবার এই-সমস্ত নাট্যকর্ম একালেও যে আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করতে পারে সে কথা জানিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্য প্রহসন গদ্যরচনা সম্বন্ধেও রথীনবাবু উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মণিমুক্তা আহরণ করেছেন ও আমাদের উপহার দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রসংগীতের পারিভাষিক আলোচনা তিনি করেন নি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রসংগীতের মৌলিকতা কোন্ কোন্ বস্তুর উপর নির্ভরশীল তা তিনি দেখিয়েছেন। লক্ষণীয় এই যে, এই গ্রন্থ পড়ার পরে ব্যক্তি-দ্বিজেন্দ্রলালের একটি পরিচ্ছন্ন চরিত্র পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তাঁর প্রত্যেকটি রচনার পশ্চাতে যে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা ছিল, যে ধ্রুব আদর্শের দ্বারা তিনি চালিত হয়েছিলেন লেখক তার বিবরণ দিয়েছেন। রথীনবাবুর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। কেবল পরিশ্রমই নয় তাঁর অনুসন্ধিৎসা এবং রসবোধ একত্র হওয়াতে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে। আশা করি গ্রন্থটি সর্বত্র আদৃত হবে।

বেশ কিছুকাল আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে দ্বিজেন্দ্রগ্রন্থাবলী বার হয়েছিল। সে গ্রন্থটির সম্পাদনাও সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানি গ্রন্থাবলীখানি নিঃশেষিত হবার পরও পুনর্মুদ্রণের সৌভাগ্য লাভ করে নি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে মিটিয়েছেন কবিপুত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় 'দ্বিজেন্দ্রকাব্য-সঞ্চয়ন' গ্রন্থখানি বার করে। এই বইখানির জন্য সংকলক এবং প্রকাশক উভয়েই বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতা পাবেন।

'সঞ্চয়ন' গ্রন্থখানিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সব কাব্যগুলির কবিতা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। সবগুলিই ভালো কবিতা। নিঃসন্দেহে এ সংকলন দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার সার্থক রূপ প্রকাশ করতে সমর্থ হবে। দিলীপবাবু নাট্যকাব্যের অংশবিশেষ এ সংকলন গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে কাব্যধর্মের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এগুলি থেকে তা বোঝা যাবে। পরিশেষে *Lyrics of Ind* গ্রন্থ থেকে দুটি কবিতা চয়ন করে শ্রীদিলীপকুমার আমাদের জানিয়েছেন ভবিষ্যতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গদ্য-সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করবেন। আশা করি অচিরকালের মধ্যে সেই সংকলনটি প্রকাশিত হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলিকে মোট পাঁচটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে— পূজা, দেশ, প্রেম, প্রকৃতি ও বিবিধ। গানগুলির বিষয়ের দিক থেকে এই বিভাগ রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতানে'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবিধ পর্যায়ে সংকলক বৈরাগ্য, সিন্ধু, অনামী, আবেশ, নাস্তিক্য ও অপেরা সংগীত জাতীয় গান ন্যস্ত করেছেন।

সংকলনে যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলির পুনরালোচনা এ ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। রথীন্দ্রবাবু তাঁর গ্রন্থে সে সব কবিতার আলোচনা করেছেন। দিলীপকুমার স্বয়ং কবি। সুতরাং তাঁর বিচারের উপর আস্থা স্থাপন করতে কুণ্ঠা নেই। 'হাসির গান' পর্যায়ে তানসান-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ, নন্দলাল ইত্যাদি কবিতা যে এখনও চমক সৃষ্টি করতে পারে, আমাদের সুপ্তিকে নাড়িয়ে দিতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। আষাঢ়ের 'কর্ণবিমর্দন-কাহিনী'র কথা কার না পড়ে। মন্দ্র কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রকাব্যপ্রতিভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি সহজে উপলব্ধ হয়ে আসে। আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে ছন্দের যে বিচিত্র রূপনির্মাণ-কলা কবিকে আকৃষ্ট করেছিল সংকলক সেরকম কবিতা গ্রন্থে স্থান দিয়ে পাঠকদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

গ্রন্থটির একটি অভিনবত্বের দিক হল সংকলক বাংলার কয়েকজন লেখক-সুরকার-কবিকে আহ্বান করেছেন দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে। শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ দৃষ্টি দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য কাব্য ও সংগীতের আলোচনা করেছেন। 'প্রাক্‌কথন' প্রবন্ধটিতে কালিদাসবাবু দ্বিজেন্দ্রকাব্য ও সংগীত নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের সঙ্গে তিনি যে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। নিজে কবি বলে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার রীতিবৈচিত্র্য নিয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক সংগীতগুলিতে মাঝে মাঝে কয়েকটি ছত্র কিংবা কিছু শব্দ হঠাৎ বেমানান বলে মনে হতে পারে। কালিদাসবাবু সেসব শব্দ কিংবা ছত্র যে সঙ্গতভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছে সেকথা নিপুণভাবে বলেছেন।

রথীন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রনাট্য-আলোচনায় উৎসাহবোধ করেও শেষ পর্যন্ত বলেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের সিদ্ধি কাব্যে ও গানে। সংকলক দিলীপকুমার রায়ও একই কথা বলেছেন। আমরা অনেকেই সুরকার রূপে

দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচিত নই। এ সংকলনে জ্ঞানপ্রকাশবাবু ও রাজ্যেশ্বর বাবু সে দায়িত্ব অঙ্গীকার করে তাঁর বিভিন্ন গানের রাগরাগিণীর উল্লেখ সহ আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য সংগীতের কোনো বিশেষ দিকটি দ্বিজেন্দ্রলালে এসে মিশেছে সে কথাও পাচ্ছি। দিলীপবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দপ্রতিভা সম্বন্ধে মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের তুলনা নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালও যে বাংলা ছন্দে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনো দুটি ইংরেজি গ্রন্থ বিশেষভাবে মুগ্ধ এবং প্রভাবিত করেছিল। রিচার্ড হ্যারিস বারহাম-এর 'ইনগোল্ড্‌স্‌বি লেজেণ্ড' এবং টমাস ক্রফটন ক্রকারের 'পপুলার সংস্‌ অফ আয়র্লণ্ড'। দ্বিজেন্দ্রলাল যে গ্রন্থে উদ্ধৃত কবিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন বিশেষ করে মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে সে কথা আমাদের জানা ছিল না। কালিদাসবাবু এবং দিলীপবাবু উভয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের মিলবিন্যাসের চমৎকারিত্বের দিকটি প্রচুর পরিশ্রম করে তুলে ধরেছেন। যেমন, ভাংলো/বাংলো; মণিমঞ্জুবান/হবে পঞ্চবান, গুনগুনিয়া/হত দুনিয়া, মজার জিনিস/চিরদিন! ইশ!, বারবেলায়/তার ঠেলায়, সুখে থাকত/ভারি শাক্ত, প্রাণান্ত/জানত। এই প্রসঙ্গে মিলবিন্যাসে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আরও দুজন কবির কথা স্বতই মনে আসে— একজন প্রমথ চৌধুরী, দ্বিতীয়জন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। দিলীপকুমার বলতে চেয়েছেন আর্যগাথার উৎসর্গ কবিতাটির ছন্দে বলাকার ছন্দের পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছিল। দ্বিমাত্রিক সংস্কৃত গুরু স্বরের প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলালের সাংগীতিক মনই আকৃষ্ট হয়েছিল বেশি। ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ আছে আর্যগাথার একটি গানে— গুরু স্বরকে দীর্ঘায়িত করে প্রয়োগ করার মধ্যে যে দুঃসাহস আছে। যদি কোনো কবির লেখায় তার সার্থক প্রয়োগ পাই তবে উল্লসিত হই। দ্বিজেন্দ্রলালের দুঃসাহসিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের ত্রিস্বর স্বরবৃত্তের নমুনা হিসাবে দিলীপবাবু 'স্ত্রীর উমেদার' কবিতাটির কিছু অংশ ছন্দোলিপি করে দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রয়োগ মৌলিক। রথীনবাবু এবং দিলীপবাবু উভয়েই দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বৈচিত্র্য দেখেছেন। এই বৈচিত্র্য এসেছে অক্ষরবৃত্তের স্বরবৃত্তের প্রতিরূপে। পরিশেষে দিলীপকুমার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ছন্দের সাহায্যে কিভাবে ছবি ও গানের অপরূপ সমাবেশ হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদটির জন্য সংকলকের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। দিলীপবাবু প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করলে গানটির মাধুর্য অনেকের কাছেই অপরিজ্ঞাত থেকে যেত।

শ্রীবিজিতকুমার দত্ত

বৈদিকী। শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়। বাণীতীর্থ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ঋগ্বেদসংহিতা ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্যসৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, এবং সর্বাধিক সম্মানিত ধর্মগ্রন্থরূপে পরিগণিত। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বৈদিক মন্ত্রসমূহকে হয় অপৌরুষেয় অথবা ঈশ্বরপ্রণীত এবং নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। মনুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বেদকে 'সর্বজ্ঞানময়' এবং সর্ববিধ ধর্মের আকর রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 'বেদাদ্‌ ধর্মো হি নির্বভৌ' 'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ'— ইত্যাদি মনুবচন তাহার সাক্ষ্য। বেদের প্রতি এই শ্রদ্ধা ভারতীয় বেদপন্থী আর্যগণের চিত্তে জন্মগত সংস্কাররূপে দৃঢ়মূলভাবে

রোপিত। ইহার এক সুফল হইয়াছে এই যে বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয়গণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন; এবং সেই সশ্রদ্ধ প্রযত্নের ফলস্বরূপ আমরা মহেঞ্জোদারোর সিন্ধুসভ্যতারও পূর্ববর্তী (?) বৈদিক সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অমূল্য নিদর্শনরাজি এখনও পর্যন্ত অবিকৃতভাবে অনুশীলন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

বৈদিক যুগে 'ঋষি' ও 'কবি' এই দুইটি শব্দই ছিল সমানার্থক। 'ঋষি' শব্দের অর্থ 'দ্রষ্টা'। যাঁহারা অলৌকিক শক্তিবলে অতীন্দ্রিয় ও শাশ্বত, অতীত অনাগত ও বর্তমান, সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট সর্বজাতীয় অর্থ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে সমর্থ, তাঁহারাই 'ঋষি', তাঁহারাই 'কবি'। 'অপশ্যমস্য মহতো মহিত্বম্ / অমর্ত্যস্য মর্ত্যাসু বিক্ষু'। এই অলৌকিক দর্শনশক্তি বৈদিক ঋষিকবিগণ লাভ করিতেন অগ্নি, ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতাগণের প্রসাদে। সোমদেবতাকে উদ্দেশ করিয়া এক মন্ত্রে বলা হইয়াছে— 'ঋষিমনা য ঋষিকৃৎ স্বর্ষাঃ / সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্',; আবার, 'ঋষির্বিপ্রো বিচক্ষণস্ত্বং কবিরভবো দেববীতমঃ'— ইত্যাদি। সুতরাং বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ দেবতার প্রসাদে সেই অলৌকিক দৈবী শক্তির অধিকারী হইতেন। অতএব, মন্ত্ররচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন কর্তৃত্ববোধ না থাকিবারই কথা। কিন্তু ঋগ্বেদীয় মন্ত্রসমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ঋষিগণ তাঁহাদের অলৌকিক দর্শনক্ষমতা সম্পর্কে যেমন সচেতন ছিলেন, অনুরূপভাবে সচেতন ছিলেন মন্ত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদন বিষয়ে; ছন্দোনির্বাচন, শব্দচয়ন, অলংকার-প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের সাবধানতা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল বলিয়া তো মনে হয় না। বহু ঋক্‌মন্ত্রে মন্ত্রকৃৎ ঋষি তক্ষার সহিত উপমিত হইয়াছেন। সুনিপুণ রথকার যেমন যথাযথভাবে তক্ষণকরতঃ রথটিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করে, সেইরূপ মন্ত্রকৃৎ ঋষি আপন মনীষার সাহায্যে মন্ত্রবর্ণটিকে আরাধ্য দেবতার হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিবার জন্য সতত যত্নশীল— 'এতং তে স্তোমং তুবিজাত বিপ্রো / রথং ন ধীরাঃ স্বপা অতক্ষম্ /', 'ইন্দ্র ব্রহ্ম ক্রিয়মাণং জুষস্ব / যা তে শবিষ্ঠ নব্যা অকর্ম / বস্ত্রেব ভদ্রা সুকৃতা বসূযুঃ / রথং ন ধীরাঃ স্বপা অতক্ষম্'— ইত্যাদি। অতএব বৈদিক ঋষিকবিগণ শুধু অলৌকিক দৈবী শক্তিসম্পন্নই ছিলেন না, তাঁহারা আত্মসচেতন সুনিপুণ ভাষাশিল্পীও ছিলেন। এই দিক্ দিয়া প্রাচীন ঋষিকবিগণের সহিত পরবর্তী লৌকিক কবিগণের এক ঘনিষ্ঠ সাজাত্য বর্তমান। অতএব বৈদিক মন্ত্রগুলিকে যেমন অতীন্দ্রিয় শাশ্বত ধর্মের আকরস্বরূপে আলোচনা করিতে পারা যায়, সেইরূপ সুনিপুণ শিল্পকর্মরূপেও ঐগুলির অনুশীলন করা অসম্ভব বা অযথার্থ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও পাশ্চাত্ত্য দেশে বৈদিক সূক্তসমূহের কাব্যসৌন্দর্য নানাদিক্ দিয়া উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করিবার বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে বটে, তথাপি বেদের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষে ঋগ্বেদকে স্বতন্ত্র শিল্পসৌন্দর্য-মণ্ডিত কবিকর্মরূপে আলোচনা করার কোনো সার্থক উদ্যম এযাবৎ অতি স্বল্পই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সায়ণভাষ্য অবলম্বন করতঃ উইল্‌সন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি ভাষান্তরের সহিত মিলাইয়া সমগ্র ঋগ্বেদের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু বৈদিক গবেষণার ধারা বর্তমান যুগে তদানীন্তন অনুসৃত পদ্ধতি হইতে বহুলাংশে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে— বিশেষতঃ ফ্রান্স ও জার্মানিতে, নবীন পদ্ধতি অবলম্বনে এবং আধুনিক গবেষণার উপর ভিত্তি করিয়া একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে দুঃখের বিষয় সমগ্র ঋগ্বেদের দ্বিতীয় কোনো বঙ্গানুবাদ আর আমরা দেখিলাম না।

কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদের সাহায্যে ঋগ্বেদীয় সূক্তসমূহের কাব্যসৌন্দর্য ও শিল্পসুষমা, ঋষিকবিগণের গভীর ভাবাবেগ—ইহাদের কোনোটিরই যথাযথ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে। ঋষিগণের কবিত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে বৈদিক সূক্তসমূহের কাব্যানুবাদের মধ্য দিয়াই তাহা সম্ভব। কিন্তু সেই কাব্যানুবাদ এক দিকে যেমন মূলানুগ এবং নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রয়োজন, সেইরূপ অনুবাদকের কবিত্বের সহিত সৌষ্ঠববোধের সমন্বয় তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হওয়া চাই। এই প্রসঙ্গে একজন সুবিখ্যাত ফরাসী মনীষীর উক্তি মনে পড়িবে—'Les traductions sont comme les femmes; lorsqu'elles sont belles elles ne sont pas fidèles et lorsqu'elles sont fidèles elles ne sont pas belles.' ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্তই দেবস্তুতি; তথাপি লৌকিক জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছ আচার-অনুষ্ঠান, সমসাময়িক রাজন্যবৃন্দের স্তুতি, নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণও ঋষিগণের প্রজ্ঞার বহির্ভূত ছিল না। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন—"উচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈর্ঋষীণাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি।" সুতরাং ঋগ্বেদের এক দিকে যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও হিরণ্যগর্ভসূক্ত, দেবীসূক্ত, সৃষ্টিসূক্ত প্রভৃতি ভাবগম্ভীর মন্ত্রবর্ণগুলি রহিয়াছে, অনুরূপভাবে আর-এক দিকে আছে অক্ষসূক্ত, ঝঞ্ঝাসূক্ত, অরণ্যানীসূক্ত, রাজা সুদাসের যুদ্ধ, নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ, পুরূরবা ও উর্বশীর সংবাদসূক্ত ইত্যাদি। অবশ্য বেদকে যাঁহারা নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মন্ত্রবর্ণকে লৌকিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। আচার্য যাস্ক তাঁহার নিরুক্তভাষ্যে সেইজন্য বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন—অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, নৈরুক্ত ইত্যাদি। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যান-পদ্ধতিরও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। বেদের এই 'ঐতিহাসিক ব্যাখ্যান'-ই,—ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় 'historical interpretation of the Vedas'—আধুনিক পণ্ডিতগণের অভিমত। ইহার দ্বারা বেদকে আমরা ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশিষ্ট এবং প্রাচীনতম স্তরের বাঙ্ময় সাক্ষ্যরূপে দেখিতে শিখিয়াছি। বেদকে শুদ্ধমাত্র ধর্মগ্রন্থরূপে দেখিতে অভ্যস্ত বলিয়া, আমরা ইহার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য-নাটকাদির বীজ নিহিত। ঋগ্বেদের অন্তর্গত পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটক ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এমনকি স্বয়ং ব্যাসদেব 'মহাভারত' সম্বন্ধে এমন কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই যে—"দশভ্য ঋক্‌সহস্রেভ্যো নির্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্"। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েকজন পূর্বসূরি ঋগ্বেদীয় মন্ত্ররাজির কিছু কিছু বঙ্গানুবাদ ক্যাব্যাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই স্বল্প। তাহার দ্বারা ঋগ্বেদের অনন্ত বৈচিত্র্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কবি শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বৈদিকী' নামক কাব্যগ্রন্থে ঋগ্বেদের অন্তর্গত অল্পাধিক ত্রিশটি নাতিদীর্ঘ সূক্ত বা সূক্তাংশের একটি শোভন অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাংলাসাহিত্যের একটি শাখাকে সমৃদ্ধ করিলেন। সূক্তগুলির নির্বাচন বেশ সুনিপুণ হইয়াছে; ইহার দ্বারা বৈদিক মন্ত্রকৃৎ কবিগণের কল্পনার বিচিত্র লীলার কিছুটা আভাস আমরা পাই। অনুবাদ যে বেশ সাবলীল হইয়াছে তাহা অকুণ্ঠচিত্তেই বলিতে পারা যায়। মন্ত্রের গাম্ভীর্যও যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেজন্যও অনুবাদক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অনুবাদকের

আর-একটি বিশেষ কৃতিত্ব এইযে, প্রতিটি অনুবাদই আধুনিক পাঠকের সাহিত্যরুচির অনুগামী হইয়াছে, কোথাও অনুবাদভঙ্গী আধুনিক বাংলাকবিতার পাঠকসমাজের রুচির পরিপন্থী হয় নাই। ইহাতেই অনুবাদের সার্থকতা। বিশেষতঃ 'বরুণ-সূক্ত' 'অরণ্যানী-সূক্ত' প্রভৃতি কয়েকটি সূক্তের অনুবাদে ওজোগুণসম্পন্ন গম্ভীর গদ্যচ্ছন্দের সুনিপুণ প্রয়োগ অনুবাদকের সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রন্থের অন্তে সন্নিবিষ্ট 'বৈদিকী' নামক স্বতন্ত্র কবিতাটিতে বৈদিক মন্ত্রকৃৎ ঋষিগণের উদ্দেশে অনুবাদকের গভীর মমতাপূর্ণ কাব্যোচ্ছ্বাসের ভিতরে সমগ্র অনুবাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটি বিধৃত রহিয়াছে। উক্ত কবিতার অন্তিম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের বর্তমান সমালোচনার উপসংহার করিতে চাই—

আজও প্রতিদিন তেমনি প্রভাতে নবীন সূর্য্য উঠে,
তেমনি হাসিয়া তরুণী উষার আঁচল ধরিতে ছুটে।
আজিও অরণি-মন্থনে বনে অনল উঠিছে জ্বলি,
আজিও মরুৎ বজ্র হানিয়া চলিছে আকাশ দলি,
আজিও নবীন-নীরদ-পুঞ্জে ছেয়ে যায় নীলাকাশ,
আজিও দেবতা বর্ষণ ঢালি মিটায় ধরার আশ।
কত সুন্দর, কত মনোহর! তবু যেন মনে হয়
প্রাণের পাত্র ভরে না'ক সব— খানিক শূন্যময়!
সেদিন প্রভাতে সূর্য চাহিয়া গেয়েছিল যেই প্রাণ
তাহার খানিক হারায়ে ফেলেছি, নাহি আর সন্ধান!
আজিকার এই উদয়-আকাশ-পানে চাহি মনে হয়
হে ঋষি কুৎস! তোমার সূর্য সে যেন আমার নয়!

পরিশেষে আমরা শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই, এবং আশা করি তিনি ঋগ্বেদের অন্যান্য সূক্তরাজির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালি পাঠকসমাজকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৯, পৃ ১৪৫, শেষ ছত্র। ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্থলে পোপ হবে।

পোপের উক্তিটি হচ্ছে—

Know then thyself, presume not God to scan
The proper study of mankind is Man.

—*Essay on Man*, Epistle ii,

স্বরলিপি

পিণাকেতে লাগে টঙ্কার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার ॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি   সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার ॥
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি,   সুরপরিষদ বন্দি—
তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার।
দানবদন্ত তর্জি   রুদ্র উঠিল গর্জি—
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

ঈষৎ মধ্য লয়ে গেয়

II [জ্ঞ]মা [জ্ঞ]মা রা । রা সা সা I রা -পা মা । -জ্ঞা -া -া I
পি ণা কে তে লা গে ট ঙ্ কা ° ° র্

I [জ্ঞ]মা মা -া । রা সা -া I রা -া জ্ঞা । রা [স]ন্া -া I
ব সু ন্ ধ রা র্ প ন্ জ র ত °

I সা -া -া । -া -া -া I [র্স]র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
লে ° ° ° ° ° কং ম্ প ন জা গে

I র্জ্ঞর্মা -া র্রা । -র্সা -া -া I -মা -পা -র্সা । -না -র্সা -র্রা I
শং ঙ্ কা ° ° ° ° ° ° ° ° °

I -না -র্সা -া । -মা -জ্ঞা -া II
° ° ° ° ° র্

II মা পা ণপা । ণপা না না I না -া র্সা । -া -া -া I
আ কা শেং তেং ঘো রে ঘূ র্ ণি ° ° °

I মা -া পা । পা ণপা না I না -া র্সা । -া -া -া I
সৃ ষ্ টি র বাঁং ধ চূ র্ ণি ° ° °

I মা -পা পা । পা পা পমা I পা -ণা ণধা । ণধা ধণা পা I
ব জ্ জ্র ভী ষ ণং গ র্ জং নং রং ব

I {প}র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রর্জ্ঞা -র্মা র্রা । -া -র্সা -া I
প্র ল য়ে র জ য় ডং ঙ্ কা ০ ০ ০

I -মা -পা -র্সা । -না -র্সা -র্রা I -না -র্সা -া । -মা -জ্ঞা -া II
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

II মা -া পা । পা পা পা I পা -মা মা । -ণা -া -া I
স্ব র্ গ উ ঠি ছে ক্র ন্ দি ০ ০ ০

I ধা ণা ধা । ণা ধা পা I পধা -মা পা । -া -া -া I
সু র প রি ষ দ বং ন্ দী ০ ০ ০

I মা পা পমা । মণা ণা ণা I ধা -া ণা । ধা পা -মা I
তি মি রং গং হ ন দুঃ ০ স হ স্রা ০

I পা -া -মা । -জ্ঞা -া -া I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা । -া রা সা I
তে ০ ০ ০ ০ ০ উ ঠে শৃং ঙ্ খ ল

I রা -া সা । -া -া -া I মা পা পা । পণা -পা না I
ঝ ঙ্ কা ০ ০ র্ দা ন ব দং ম্ ভ

I না -া র্সা । -া -া -া I মা -া পা । পা ণপা না I
ত র্ জি ০ ০ ০ রু ০ দ্র উ ঠিং ল

I না -া র্সা । -া -া -া I র্সণা -া ণা । ণা -া ণা I
গ র্ জি ০ ০ ০ লং ণ্ ড ভ ণ্ ড

I ধা ণা ণা । ণা ধা -পা I পর্জ্ঞা -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I
লু টি ল ধু লা য়্ অং ভ্ ভ্র ভে দী অ

I {র্জ্ঞ}র্মা -া র্রা । -া -র্সা -া I -মা -পা -র্সা । -না -র্সা -র্রা I
হ ঙ্ কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -না -র্সা -া । -মা -জ্ঞা -া II II
০ ০ ০ ০ ০ র্

সম্পাদকের নিবেদন

আমরা অনেক সময়ে আক্ষেপ করে থাকি যে, আমরা আমাদের দেশের অনেক কৃতী সন্তানের কথা ভুলে গিয়েছি ; একদা যাঁদের আমরা নিত্য স্মরণ করেছি তাঁদের কথা আমরা নাকি মনে রাখি নি। নিজেদের বিরুদ্ধেই আমাদের এ অভিযোগ ; তবুও মনে হয় আমরা বুঝি অকারণেই নিজেদের উপর এই দোষ আরোপ করছি।

প্রত্যহ নামোচ্চারণ না করলেই সম্ভবত বিস্মৃত হওয়া হয় না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ভবভূতি কালিদাস ইত্যাদি নাম আমরা রোজ উচ্চারণ করি নে ; শেলী কীটস মিণ্টন ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে রোজ সময় কাটাই নে ; সুতরাং তাঁদের আমরা মনে রাখি নি, এমন বুঝি নয়।

আমাদের জীবনে মাঝে মাঝে আসে উৎসব এবং উপলক্ষ। সেই সুযোগে, নতুন ক'রে পাব ব'লে নূতন ভাবে আমরা কারও কারও সম্বন্ধে নূতন করে আলোচনা হয়তো করি। এর থেকে এমন কথা যেন মনে না হয় যে, এতদিন যার কথা আমরা ভুলে ছিলাম আজ তার কথা হঠাৎ মনে পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ বছরে তাঁর জন্মশতবার্ষিক-উৎসব পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে আমরা তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করে তাঁর উদ্দেশে শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-দুইয়ের ছোট ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একই যুগে একই কালে দুই জনে পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা করেছেন। পাশাপাশি থাকলে কখনো কখনো সংঘর্ষ ঘটে— কখনো মনের, কখনো-বা মতের। সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে এঁদের দুজনের মধ্যে মতান্তর যে ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেটা একটা ঘটনা অবশ্যই ; এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার ভাষা সময় সময় হয়তো সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়েও গেছে। কিন্তু সেটাকে বড় করে দেখার আবশ্যকতা নেই। মৃত্যুতে সেসব ধুয়ে মুছে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'চিত্রাঙ্গদা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ কথা বলেছেন বটে, কিন্তু প্রায় সেই সময়েই (বাণী।১৩১৭ আশ্বিন-কার্তিক) রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, বলেছেন, "এ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের গৌরব।" তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য ছিল মতের ও পথের ; কিন্তু তার কথা আজকের দিনে ভাবব না। উভয়ের মধ্যে যেটুকু অন্তরঙ্গতা ছিল, আজকের দিনে— বিশেষ করে বর্তমানে, শতবার্ষিক-উৎসব উদ্‌যাপনের সময়ে— আমরা সে কথাই স্মরণ করব। অন্তরঙ্গতার নিদর্শন রূপে এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি সনেট— একটি নিমন্ত্রণলিপি— দ্বিজেন্দ্রহস্তাক্ষরে মুদ্রিত হল।

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' প্রবন্ধ রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের 'সনেট'-পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীনন্দলাল বসুর 'শীতের পদ্মা' চিত্রের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-চিত্রশালা থেকে পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সহ-সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

শ্রেষ্ঠ
বিস্কুট
বাজার দরে
ARROWROOT
লিলি
স্বাদে ও গন্ধে
অতুলনীয়
লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের
নিশীথে
রূপায়ণে
উত্তম-সুপ্রিয়া
রাধামোহন
ছায়া দেবী
পরিচালনা
অগ্রগামী
মিনার • বিজলী • ছবিঘরে আসছে

প্রকাশিত হইয়াছে

আত্মজীবনী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। অতুল ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাঁহাকে অধিকার করিয়া ক্রমে তাঁহার সুখশান্তি হরণ করিল এবং কিরূপে পরে সেই পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার অনুভূতি আনিয়া দিল— এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন।"

আত্মজীবনীর এই সংস্করণে পরিশিষ্ট অংশে মহর্ষির জীবনের আরও অনেক তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে, এবং মহর্ষির যুগ-সম্পর্কিত কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত হইয়াছে।

বিষয়সূচী ও বংশলতিকা সন্নিবিষ্ট

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র

মূল্য ১২·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭